১৩ জুন ১৯৯০ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ সাত টাকা

আনন্দমেলা

■ বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস
■ ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের ভূতের গল্প

এক দশকের সেরা চমক

সাড়ে উনত্রিশ ইঞ্চি মানুষ

পৃথিবীর বৃহত্তম বাঁধাকপি। প্রায় ৫৪ কেজি

ওজন প্রায় ৫৩০ কেজি। তবু ইনি সবচেয়ে মোটা নন

সাইকেল খাচ্ছেন মিশেল লোলিটো

চমকপ্রদ ঘটনা !
আশ্চর্য সব রেকর্ড !!
কে খেয়েছেন দশটি
বাইসাইকেল ?
কে লিখেছেন হাজারেরও
বেশি রহস্য গল্পের বই ? সাতবার বাজ
পড়েও প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন কে ? কে সবচেয়ে বেঁটে,
সবচেয়ে মোটা ? এক দশকে এ-ধরনের বিচিত্র সব রেকর্ড ভাঙাগড়ার খেলায় শুধু চমক, আর চমক !

■ বেসিকের প্রথম ধাপ ■ কেরিয়ার গাইড ■ বিশ্বকাপ ফুটবল ■ রুডি ভয়লার : রঙিন পোস্টার

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - নীলাচল দা

স্ক্যান করেছেন - নীলাচল দা

এডিট করেছেন - অপ্টিমাস

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা আপনি স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে শীঘ্রই নিচের ইমেল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

optifmcybertron@gmail.com

OMEGA Sony Geometry Box

Also Available:
- Omega Glory
- Omega Liba
- Omega World Time

***OMEGA** - The ultimate in quality*

Allied Instruments Pvt. Ltd.
30-CD, Govt. Industrial Estate,
Kandivli, Bombay-400 067.
Phone: 6050425, 6050721, 6050849, 6052188
Cable: ROTOFILE Telex: 011-70020 AIPL
Fax: 6052811

OMEGA

Winner of Top Plexconcil Export Award– 1978-79-80-81-82-83-84-85-86-87

Distributors: GREATER BOMBAY: **D. Jagjivandas & Company,** 177, Abdul Rehman Street, Bombay-400 003. Ph.: 326524. MAHARASHTRA: **A. Aalok & Company,** 107, Regal Industrial Estate, Acharya Donde Marg, Sewree (West), Bombay-400 015. Ph.: 4133295/4133215. GUJARAT AND RAJASTHAN: **N. Chimanlal & Co.,** 'Jesmin' Building, Near Firdaus Flats, Khanpur, Ahmedabad-380 001. Ph.: 350198/354579. DELHI, HARYANA, PUNJAB, J. & K. & HIMACHAL PRADESH: **Bharat Traders,** C/o. Kripa Ram Sethi & Sons, 89, Chawri Bazar, Delhi-110 006. Ph.: 262854. KARNATAKA, ANDHRA PRADESH & GOA: **Sanghvi Corporation,** Suresh Bldg., No. 17, 4th Cross, Kalasipalayam, New Extension, Bangalore-560 002. Ph.: 235702. CALCUTTA & WEST BENGAL: **Sanghvi Corporation,** 63, Radha Bazar Street, 2nd floor, South Wing, Calcutta-700 001. Ph.: 269416. UTTAR PRADESH: **Sanghvi Corporation,** Kailash Shri Bldg., 14-A, Shivaji Marg, Lucknow-1. Ph.: C/0. 232872. TAMILNADU: **Sanghvi Corporation,** Bafna Complex, 1st floor, 35, Strotten Muthia Mudaliar Street, Madras-600 079. Ph: 569304. MADHYA PRADESH. KERALA, BIHAR, ORISSA, RAJASTHAN, ASSAM AND NORTH EAST INDIA: **Sanghvi Corporation,** 109 Regal Industrial Estate, Acharya Donde Marg, Sewree (West), Bombay-400 015. Ph.: 4133295/4133215.

২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৭ □ ১৩ জুন ১৯৯০ □ ১৬ বর্ষ ৫ সংখ্যা

আনন্দমেলা

■ সম্পূর্ণ উপন্যাস (প্রথমাংশ) ■
বনে-জঙ্গলে বরেন গঙ্গোপাধ্যায় ৫৪
■ গল্প ■
বালিডাঙার মাঠ ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ২৬
কেউটের ছোবল চুনীলাল রায় ৩৬
■ প্রচ্ছদকাহিনী ■
এক দশকের সেরা চমক অভীক মজুমদার ১২
■ ধারাবাহিক উপন্যাস ■
উদাসী রাজকুমার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৭৫
সোনার গণপতি হিরের চোখ ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ৬৮
■ কমিক্স ■
টারজান ৩১, রোভার্সের রয় ৫১, গাবলু ৫৩, টিনটিন ৭১, ব্যাটম্যান ৭৩
■ টাকাকড়ি ■
আদিম ছাঁচে ঢালা টাকা ...ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৬৪
■ কবিতা ■
সত্যি কথা প্রদীপ ঘোষ ৩০
■ প্রযুক্তিবিজ্ঞান ■
বেসিকের প্রথম ধাপ অসীমরতন ঘোষ ২২
■ কেরিয়ার গাইড ■
লক্ষ্মীবাঈ ন্যাশনাল কলেজ ... অমর দাশ ৬৬
■ বিশ্ববিচিত্রা ■
তেলের খোঁজে তোলপাড় সুজাতা পাষ্টী সরকার ৩২
■ অ্যাডভেঞ্চার ■
চিতাবাঘও ভয় পায় সঙ্কর্ষণ রায় ৫
■ এই দেশ এই বিশ্ব ■
অভিযাত্রীদের স্বর্গ ...শর্বাণী ঘোষ ৮
■ খেলাধুলো ■
কারা জিতবে বিশ্বকাপ নরোত্তম পুরি ৪০
রঙিন পোস্টার : রুডি ভয়লার ৪২
কী হবে রণকৌশল স্বপ্নাতীত সরকার ৪৪
আগ্নেয়গিরির ওপর বসে আছেন ম্যানেজাররা
মানস চক্রবর্তী ৪৬
আগের তেরোটি বিশ্বকাপ অরূপ বসু ৪৮
■ নিয়মিত বিভাগ ■
চিঠিচাপাটি ৪, বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে ১০, কিওকুশিন ক্যারাটের ক্লাস ৫০, আকাশে ওড়ার কথা ৬২, শব্দসন্ধান ৬৩, ক্যাম্পাস ৬৫, আঁকিবুকি ৭০, হাসিখুশি ৭০, কুইজ ৭৮, বইয়ের খবর ৮১, নানারকম ৮২

সহকারী সম্পাদক □ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদকীয় বিভাগ □ সিদ্ধেশ্বরনাথ ভার্মা, সাধনা মুখোপাধ্যায়, শ্যামলকান্তি দাশ, রতনতনু ঘাটী, বাদল ঘোষ, বিমলকুমার পাল
শিল্প নির্দেশক □ অমিয় ভট্টাচার্য
সহযোগী □ অসিত পাল, প্রবীর সেন

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। অস্থায়ী সম্পাদক অভীক সরকার।
দাম সাত টাকা। বিমান মাশুল ত্রিপুরা ২০ পয়সা উত্তর পূর্ব ভারত ৩০ পয়সা

১২

সারা পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত ঘটছে নানা ধরনের ঘটনা। এর অনেকটাই আমাদের নজর এড়িয়ে যায়। আবার এমন কিছু ঘটনা ঘটে, এক-একজন এমন সব কাণ্ড করেন, যা দেখে বা শুনে আমরা চমকে যাই। গত এক দশকের এরকম চমকপ্রদ নানা ঘটনা ও বিচিত্র সব কাণ্ডকারখানা নিয়ে প্রকাশিত হল এবারের প্রচ্ছদকাহিনী। কে সবচেয়ে মোটা? কে সবচেয়ে বেঁটে? কোন বই সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়? সাতবার বজ্রাহত হয়েও কে বিস্ময়করভাবে প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন? সারা শরীরে হাজার হাজার মৌমাছি নিয়ে কে ঘুরে বেড়ান? এই ধরনের নানা তথ্য এই প্রচ্ছদকাহিনীকে করেছে চিত্তাকর্ষক।

৪০

ফিফা কাপ জিতে কোন দেশ বিশ্ব ফুটবলের অবিসংবাদিত চ্যাম্পিয়ান হবে, তা নিয়ে সারা বিশ্বে এখন চলছে জল্পনা কল্পনা। কেউ বলছেন পশ্চিম জার্মানি, কেউ বলছেন হল্যান্ড। আবার কেউ কেউ বলছেন, যে দলে আছেন মারাদোনা, সেই দেশেরই বিশ্বচ্যাম্পিয়ান হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আবার এমনও হতে পারে, কোনও অঘটন ঘটবে। বিজয়ী হবে নতুন কোনও দেশ।

৫

রাজহারা পাহাড়ের মাথায় লোহা পাথর খুঁজতে গিয়ে ভয়ঙ্কর চিতাবাঘের মুখোমুখি হয়েছিলেন লেখক ও তাঁর সঙ্গীরা। চিতাবাঘটি আগেই আহত হয়েছিল গুলিতে। আহত চিতা আরও বেশি ভয়ঙ্কর। শেষ পর্যন্ত কী ঘটল?

■ আগামী সংখ্যা ■

বিশেষ গোয়েন্দা সংখ্যা

শাক্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের
প্রচ্ছদকাহিনী
কে সেরা গোয়েন্দা

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ,
অদ্রীশ বর্ধন ও
সিদ্ধার্থ ঘোষের
গোয়েন্দা গল্প

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের
সম্পূর্ণ উপন্যাস (শেষাংশ)
বনে-জঙ্গলে

বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে
আরও লেখা

রোমাঞ্চকর রহস্যময় অলৌকিক

অভীক মজুমদারের প্রচ্ছদকাহিনী 'রহস্যময় অলৌকিক' পড়লাম ১৮ এপ্রিল সংখ্যায়। এই সুন্দর লেখাটি পড়ে ডেভিল, ডেমন, পোল্টার জিস্ট সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারলাম। কিন্তু গবলিন ও স্পুক সম্পর্কে বিস্তারিত লেখা হলে ভাল লাগত।

কুন্তল মণ্ডল
খালবিল মাঠ, বর্ধমান

আমি প্রতিটি সংখ্যাই মন দিয়ে পড়ি। ১৮ এপ্রিল সংখ্যার প্রচ্ছদকাহিনী রহস্যময় অলৌকিক পড়ে খুব ভাল লাগল। আমি আগে ভাবতাম যে, বিজ্ঞানে উন্নত দেশগুলিতে অলৌকিক ঘটনার কোনও বিশেষ স্থান নেই। এই লেখাটি পড়ে আমার সে ভুল ভেঙে গেল। অনেক অজানা তথ্য জানতে পারলাম।

অনিন্দ্য চক্রবর্তী
মালবাজার, জলপাইগুড়ি

অভীক মজুমদারের লেখা রহস্যময় অলৌকিক পড়লাম। দু-একটি তথ্য ছাড়া লেখাটি অপূর্ব। আমার শুধু কিছু বক্তব্য আছে।
'অলৌকিক নয়, লৌকিক' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে লেখক গেলারের চামচ ভাঙা, চলন্ত কেবল-কার থামানো ইত্যাদি অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার পেছনে থাকা সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাই গেলারের অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা ব্যাখ্যাহীন—এ-কথা বলা ঠিক নয়।

সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

১৮ এপ্রিল সংখ্যায় রহস্যময় অলৌকিক পড়লাম। ভূত সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পারলাম। এর পর যদি দেব-দেবী ও ভারতীয় মন্দির নিয়ে কোনও সংখ্যা প্রকাশ করেন, তা হলে ভাল হয়।

ভাস্কর দত্ত
জেমস লঙ সরণি,
কলকাতা-৩৪

অভীক মজুমদারের লেখা রহস্যময় অলৌকিক পড়ে ভাল লাগল। লেখাটি খুবই উপভোগ্য। একটি বিষয়ে আমার প্রশ্ন হল—লেখক লিখেছেন সাত-এর দশকে ব্রিটেন আর আমেরিকায় তোলপাড় শুরু হয়ে গিয়েছিল য়ুরি গেলারের কার্যকলাপ দেখে। গেলারের অবিশ্বাস্য অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার শেষ নেই, যে-কোনও ধাতব বস্তু টোকা দিয়ে ভেঙে বা বাঁকিয়ে দিতে পারেন তিনি। এ ছাড়াও তিনি আরও নানারকম কাজকর্ম করতে পারেন যার নাকি এখনও কোনওরকম বিশ্বাসযোগ্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়নি। এ-কথা ঠিক নয়। ডঃ আব্রাহাম কোভুর প্রমাণ করেছেন যে, য়ুরি গেলারের প্রিয় খেলাগুলি নিছক বিজ্ঞানের সূত্রের ওপর নির্ভরশীল। যেমন য়ুরি গেলারের প্রিয় খেলা ছিল মঞ্চে ঝোলানো একটি ধাতব চামচের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে তা বাঁকিয়ে দেওয়া। তিনি ব্যাখ্যা করতেন—অতীন্দ্রিয় শক্তির জোরে চামচটি বেঁকেছে। আসলে ব্যাপারটি পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মকে কাজে লাগিয়ে করা হয়। দুটি ভিন্ন ধাতুর প্রসারনাঙ্ক ভিন্ন। এইভাবে দুটি ভিন্ন ধাতুর পাতকে পরস্পরের সঙ্গে আটকে তাপ প্রয়োগ করলে তাদের প্রসারণাঙ্কের হার ভিন্ন বলেই, যে ধাতুর প্রসারণাঙ্ক কম, সেই ধাতুর পাতের দিকে সংযুক্ত পাতটি বেঁকে যায়।

সুপ্রতীক শ্যামল
আলিপুর, কলকাতা-২৭
সৌমেন চ্যাটার্জি,
সুগত চ্যাটার্জি
শিবপুর, হাওড়া

আনন্দমেলা আমার প্রিয় পত্রিকা। পনেরো বছর ধরে নিয়মিত পড়ে আসছি। ষোলো বছরের প্রথম সংখ্যার বিজ্ঞাপন পড়ে ভেবেছিলাম, সংখ্যাটিতে বিভিন্ন অলৌকিক বিষয় প্রসঙ্গে বিজ্ঞানের মতামত জানানো হয়েছে। পড়ে বুঝলাম, তা নয়। অভীক মজুমদার য়ুরির আজব অলৌকিক ঘটনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত বিজ্ঞানে এই ঘটনার কোনও ব্যাখ্যা নেই।' কিন্তু য়ুরির তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতার মৌলিক ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়েছে বিদেশী বেশ কিছু বইয়ে—একথা সবাই জানেন। বাংলা ভাষায় এই পত্রলেখকেরও একটি বই আছে, যেখানে য়ুরির অলৌকিক ক্ষমতার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।
স্বপ্ন বা চিন্তা কখন কখন কেন মেলে, যান্ত্রিক মিডিয়াম অর্থাৎ প্ল্যানচেট ও মিডিয়াম, ভূতের বাসন-কোসন ছোঁড়ার ঘটনার চূড়ান্ত ব্যাখ্যা দেওয়ার ক্ষমতা বিজ্ঞানের আছে।
জয় সেনগুপ্তের 'অতীন্দ্রিয় শক্তি' লেখাটিতে রাশিয়ার কুলগিনার তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতার কথা লেখা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে জানাই—রুশ সরকারের 'যুব সমীক্ষা' পত্রিকায় কুলগিনা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়েছিল সোভিয়েত বিজ্ঞান অকাদেমি কুলগিনার অলৌকিক ক্ষমতার পরীক্ষা নেওয়ার পর সোভিয়েত বিজ্ঞান অকাদেমির কোভাজারভ ঘোষণা করেন—কুলগিনা অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী। আমাদের 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র পক্ষ থেকে জানিয়েছি-যুব সমীক্ষা পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদককে চিঠি লিখে যে, ওই অলৌকিক ক্ষমতা লৌকিক কৌশলে আমিও ঘটিয়ে দেখাতে পারি। তাঁরা যদি কুলগিনার রহস্য ভেদ করে সত্য জানতে আগ্রহী হন, তাঁরা যেন আমাদের সহযোগিতা গ্রহণ করেন।

প্রবীর ঘোষ
সাধারণ সম্পাদক
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি
দেবীনিবাস রোড, কলকাতা-৭৪

অ্যাডভেঞ্চার

চিতাবাঘও ভয় পায়

রাজহারা পাহাড়ের গভীর বনে রোমাঞ্চকর এক অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন **সঙ্কর্ষণ রায়**

চারদিকে তাকিয়ে বাতাসে গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে ফরেস্ট রেঞ্জার শ্যামরতন দুবে বললেন, "মনে হচ্ছে আহত চিতাবাঘটা ধারেকাছেই আছে। বেশি দূরে যাওয়ার ক্ষমতা ওর নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে চিতাবাঘটা জখম হল কী করে ?" বলে তিনি একে-একে আমাদের পাঁচজনের দিকে তাকালেন। আমরা পাঁচজন মধ্যপ্রদেশের গভীর বনের মধ্যে এই রাজহারা পাহাড়ের মাথায় লোহা-পাথর হেমাটাইট খুঁজছিলাম। পাহাড়ের নীচে আমাদের ক্যাম্প। পাঁচজনের মধ্যে চারজন বাঙালি এবং একজন দক্ষিণ ভারতীয়। আমি ছাড়া বাকি তিনজন বাঙালির নাম গোপিন, মৃত্যুঞ্জয় ও তারাচরণ, দক্ষিণ ভারতীয়টির নাম গুরুজাদা বেঙ্কটরাও।

শ্যামরতনের প্রশ্নের উত্তরে আমরা কেউ কোনও কথা না বলাতে তিনি আবার প্রশ্ন করেন, "আপনারা কেউই কি জানেন না চিতাবাঘটি জখম হল কী করে ?"

উত্তরে তারাচরণ কী যেন বলতে যাচ্ছিল, চোখের ইশারায় তাকে থামিয়ে দিয়ে গোপিন বলল, "চিতাবাঘটি কীভাবে আহত হল তা আমরা জানব কী করে ! আমরা আমাদের কাজকর্ম নিয়ে দিনরাত ব্যস্ত থাকি…"

"রাত্রে বন্দুকের গুলির আওয়াজ শুনতে পাননি ?"

"শুনেছি, রোজ রাতেই শুনি, চোরাশিকারিরা এখানকার বনে-জঙ্গলে শিকার করে বেড়ায়…"

"সে যাই হোক, চিতাবাঘটি যখন ঘায়েল হয়েছে, তখন তাকে শিকার করে ফেলাই উচিত, কারণ আহত বাঘ ও চিতাবাঘ মানুষখেকো হয়ে ওঠে। শুনেছি আপনি তো খুব ভাল শিকারি…"বলে গোপিনের দিকে তাকালেন শ্যামরতন।

"আমিও শিকারি।" তারাচরণ বলল, "আমার কাছে নতুন পয়েন্ট থ্রি-ওয়ান-ফাইভ বোর রাইফেল আছে…"

"আপনারা দু'জনে মিলে শিকার করে ফেলুন চিতাবাঘটাকে। মনে রাখবেন, ওকে আপনারা শিকার না করলে ওই আপনাদের শিকার করে ফেলবে।"

শ্যামরতন চলে যাওয়ার পর মৃত্যুঞ্জয় বলল, "তা হলে এখনই বেরিয়ে পড়া যাক। বাতাসে ওর গন্ধ পাচ্ছি, এই নালা ধরে এগিয়ে যাওয়া যাক।"

"নিশ্চয়ই। কিন্তু ওকে শিকার আমিই করব," তারাচরণ বলল।

"তা তো করবেই।" তারাচরণের মুখের ওপরে ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে গোপিন বলল, "তুমিই ওকে জখম করেছ, তোমারই উচিত

চোখে নিষ্ঠুরতা

ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে

ওকে মারা। আচ্ছা তারাচরণ, চিহোড়লতার ঝোপটি নড়ে উঠতেই তুমি হুট করে গুলি করলে কেন ? ওকে তো তুমি দেখতেও পাওনি।"

"আমি গুলি না করলে তো আপনি করতেন।"

"আমি গুলি করলে ও ঠিক মারা পড়ত। কারণ আমি ওর মাথায় তাক করেছিলাম। যা হওয়ার তা হয়েছে, এখন চলো, ওকে খুঁজে বের করি।"

মৃত্যুঞ্জয়, বেঙ্কটরাও ও আমার দিকে তাকিয়ে তারাচরণ বলল, "এরা তো নিরস্ত্র, এরাও আমাদের সঙ্গে যাবে ?"

"এদের অস্ত্র এদের গলা।" গোপিন জবাব দিল, "দরকার হলে এরা এমন চিৎকার করবে যে চিতাবাঘ ভয় পেয়ে যাবে। চিতাবাঘের বা বাঘের ডাক শুনে যেমন আমরা ভয় পাই, আমাদের ডাক শুনে তেমনই ওরাও ভয় পায়।"

"হাঁকডাক তো আমরাও করতে পারতাম।" তারাচরণ বলল, "কেবলমাত্র হাঁকডাক দেওয়ার জন্য এদের আমাদের সঙ্গে যাওয়ার দরকার আছে কি ?"

"এদের অন্যান্য গুণও আছে। সঙ্কর্ষণ জোরে দৌড়তে পারে না, গাছে চড়তে পারে না, কাজেই তাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। মৃত্যুঞ্জয় গন্ধ-বিশেষজ্ঞ, বাতাসে বয়ে আসা গন্ধ থেকে সে বুঝতে পারবে।"

"মৃত্যুঞ্জয়কে অনুসরণ করে আমরা নালার ক্ষীণ ধারার পাশ দিয়ে সেগুনবনের একেবারে গভীরে ঢুকে পড়লাম। সেগুনবনের মাঝখানে একটা ডোবার ধারে এসে থমকে দাঁড়াল মৃত্যুঞ্জয়। তার চোখের দৃষ্টিতে এমন কিছু ছিল যা দেখে আমি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠি।

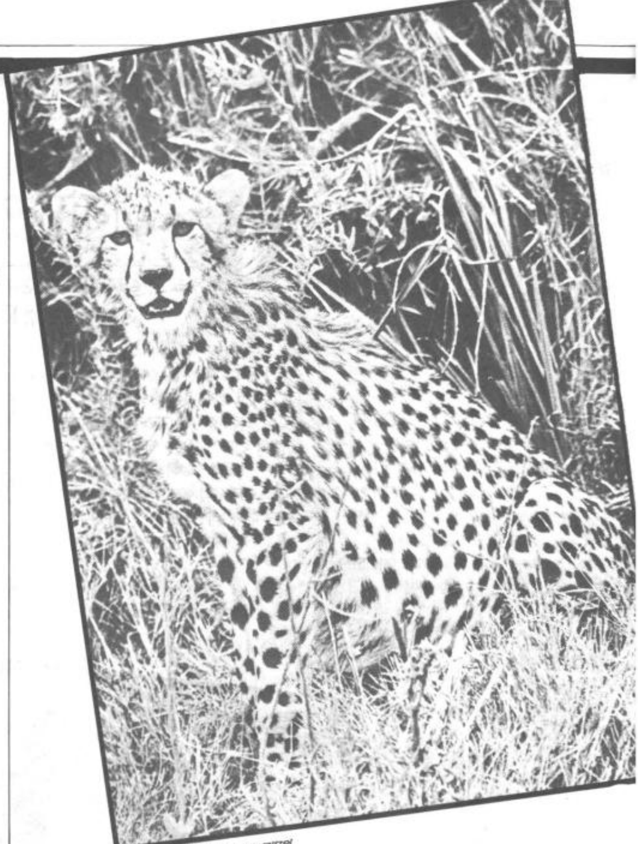

লুকিয়ে ছিল চিহোড়লতার ঝোপে

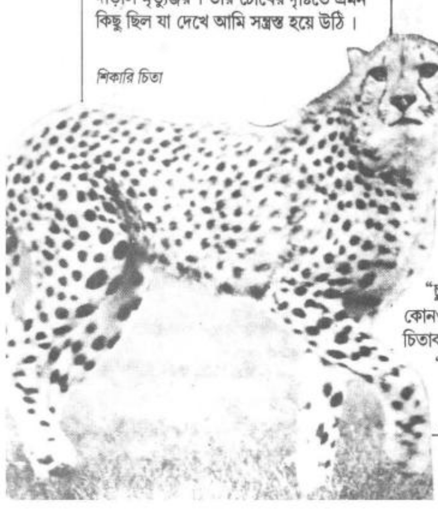

শিকারি চিতা

মৃত্যুঞ্জয়ের মুখের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে গোপিন বলল, "তুমি বলতে চাও চিতাবাঘটা এখানেই..."

"হ্যাঁ।" গোপিনের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মৃত্যুঞ্জয় বলল, "এখানেই আছে সে।"

বেঙ্কটরাও বলল, "ব্যানার্জিসাহেব গুণের কথা বলেননি। লেপার্ডটা বেরিয়ে আসার আগে বলে ফেলুন..."

"চুপ।" ধমক দিয়ে ওঠে গোপিন, "আর কোনও কথা নয়। তুমি কত গুণধর, চিতাবাঘটি বেরিয়ে এলেই বোঝা যাবে।"

"আমিই বলি।" মৃদুমন্দ হাসতে হাসতে বেঙ্কটরাও বলল, "আমাদের এই দলের মধ্যে আমিই শ্রেষ্ঠ টোপ, কারণ সকলের চেয়ে আমিই বেশি হৃষ্টপুষ্ট।"

"দেখা যাবে। চিতাবাঘটার আচরণ থেকেই বোঝা যাবে।"

বাতাসে বয়ে আসা ফুলফল ও গাছপালার গন্ধের মধ্যে চিতাবাঘের গায়ের গন্ধের আভাস মৃত্যুঞ্জয় যতই পাক, চিতাবাঘটিকে আমরা খুঁজে পাই না।

শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে আমরা ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। যে পথ দিয়ে এসেছিলাম, বন্য প্রাণীদের পায়ে চলা সেই পথ দিয়ে আমরা ফিরে যাই।

গোপিন বলল, "চিতাবাঘটা এখান থেকে পালিয়ে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে।"

"না, না, পালায়নি, কাছাকাছিই আছে।" মৃত্যুঞ্জয় বলল, "আমি গন্ধ পাচ্ছি।"

"কাছেই আছে তো ওকে খুঁজে-খুঁজে পাচ্ছি না

কেন ?"
গোপিনের মুখের কথা মুখেই থেকে যায়, একটা পাথরের স্তূপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে চিতাবাঘটি। তারাচরণের রাইফেলের গুলি লেগে তার একটি পা জখম হয়েছে, তিন পায়ে তীরের বেগে ছুটে যায় বেঙ্কটরাওয়ের দিকে।
"দেখছেন তো!" বেঙ্কট রাও আর্তস্বরে বলে ওঠে, "আমার দিকেই আসছে।"
পরমুহূর্তে বিকট চিৎকার করে ওঠে বেঙ্কটরাও। তার চিৎকার শোনামাত্র থমকে দাঁড়ায় চিতাবাঘটি। আমরাও চমকে উঠি। মানুষের গলা থেকে এমন অমানুষিক আওয়াজ কল্পনাও করা যায় না। চিতাবাঘটি

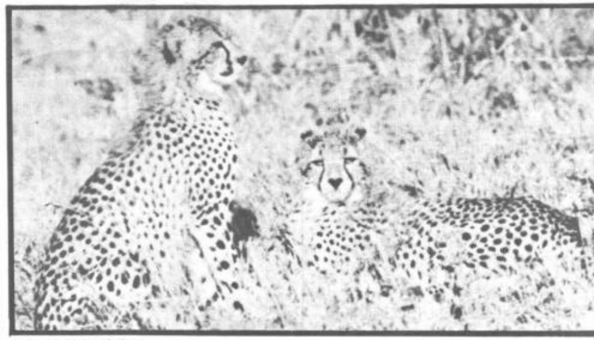

এ ওদের আপন সাম্রাজ্য

পাথরের স্তূপের আড়ালে

রীতিমত ভয় পেয়েছে বলে মনে হল! কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে চিতাবাঘটি মৃত্যুঞ্জয়ের দিকে দৌড়ে গেল। তারাচরণের দিকে তাকিয়ে গোপিন বলল, "তারাচরণ, তুমিই ওকে মারবে বলেছিলে না?"
তারাচরণের সর্বাঙ্গ কাঁপছিল। কাঁপা হাতে তুলে ধরে সে তার রাইফেল। সঙ্গে-সঙ্গে তার কাছে ছুটে গিয়ে রাইফেলসুদ্ধু তাকে জাপটে ধরে বেঙ্কটরাও।
ইতিমধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে চিতাবাঘটি। উপুড় হয়ে মাটির ওপরে পড়ে যায় মৃত্যুঞ্জয়। তার পিঠে একটি থাবা রেখে অন্য থাবাটি দিয়ে তার ওপরে চূড়ান্ত আঘাত হানবার মুহূর্তে গর্জে ওঠে গোপিনের রাইফেল।

চোখের নিমেষে ধরাশায়ী হল চিতাবাঘটি, কয়েক সেকেণ্ড মাটির ওপরে গড়াগড়ি খেয়ে নিস্পন্দ হয়ে যায় তার দেহ। অব্যর্থ গোপিনের রাইফেলের গুলি, বোধ হয় তা চিতাবাঘটির হৃৎপিণ্ড ভেদ করেছে।
ক্যাম্পে ফিরে আসার পর বেঙ্কটরাওয়ের ওপরে প্রায় চিতাবাঘের মতোই ঝাঁপিয়ে পড়ে তারাচরণ, প্রায় চিৎকার করে বলে, "আমি যখন চিতাবাঘটাকে গুলি করতে যাচ্ছি, তখন তুমি আমাকে ওরকম জড়িয়ে ধরলে কেন? লেপার্ডটার মাথার দিকে তাগ করেছিলাম আমি আমার পয়েন্ট থ্রি-ওয়ান-ফাইভ বোর রাইফেল দিয়ে।"
"তুমি তো আমার মাথার দিকে তাক করেছিলে!" কাতর স্বরে বললে বেঙ্কটরাও। "তোমার মাথার দিকে তাক করেছিলাম মানে! লেপার্ডটার মাথা তাক করে ব্রেন শট্ নিতে যাচ্ছিলাম।"
"আসল কথা কী জানো!" মৃদু হেসে আমি বললাম, "আসল কথা হচ্ছে এই যে, অর্জুন যেমন লক্ষ্যভেদের সময় মাছের চোখ ছাড়া আর কিছু দেখেননি, তারাবাবু তেমনই লেপার্ডের মাথা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাননি। মাঝখানে যে তোমার মাথা এসে পড়েছে তা তাঁর নজরেও আসেনি।"
সবাই কেমন চুপ হয়ে গেল। চিতাবাঘকে গুলি করতে গিয়ে তারাচরণ একটা বিরাট দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলত, সেই কথা ভেবে সকলেই বাক্যহারা হয়ে গেল। নির্জন বনে রাজহারা পাহাড়ের মাথায় বাতাসও ভারী হয়ে উঠল। আমার কথার উত্তরে তারাচরণ আর কোনও কথা বলতে পারল না।

ফোটো : 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক'-এর সৌজন্যে

অভিযাত্রীদের স্বর্গ অ্যাপালাসিয়ান ট্রেইল

সত্তর বছর বয়সেও অভিযাত্রীরা যান এখানে । লিখেছেন **শর্বাণী ঘোষ**

হঠাৎ একটা নাম-না-জানা পাখির টিটি ডাকে চারদিকের নৈঃশব্দ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল । অতল শূন্যে ঢেউ তুলে মুহূর্তে পাখিটি উধাও হয়ে গেল । যতদূর চোখ যায় সবুজ আর সবুজ । প্রকৃতির অপরূপ এই সৌন্দর্য ভুলিয়ে দেয় দীর্ঘ পথ চলার ক্লান্তি ।

অ্যাপালাসিয়ান ট্রেইলের নেশায় কত মানুষ যে মেতে উঠেছেন তার হিসেব নেই । স্টিভ নাকোল্‌স, গেটউডস, গারভে বা ডয়েলস-এর মতো মানুষরা বারবার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন এই অভিযানে । এঁরা প্রত্যেকেই 'টু থাউস্যান্ডস-মাইলার' নামে পরিচিত । এক বছরের মধ্যেই তাঁরা পাড়ি দিয়েছেন ২১০০ মাইল পথ । শুনলে অবাক হতে হয়, সত্তর বছর বয়সে গেটউডস এই ট্রেইল অভিযান করেছিলেন । এডগারভে লিখেছিলেন ট্রেইল সম্পর্কে মস্ত এক বই, আর ওয়ারেন ডয়েল এই অভিযান চালিয়েছিলেন অন্তত সাতবার । এঁরা প্রত্যেকেই আজ জীবন্ত কিংবদন্তি । কিন্তু প্রতি বছর যে লক্ষ-লক্ষ মানুষ এখানে আসেন, তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই এই প্রবাদপ্রতিম মানুষদের সম্পর্কে কোনও খবর রাখেন না । এক কিংবা দু' সপ্তাহের ছুটি কাটাতে এসে অধিকাংশ পর্যটক নিজেদের সুযোগ সুবিধেমতো ছোট-ছোট নির্দিষ্ট কিছু জায়গা বেছে নেন । ফলে এই অভিযানের আসল মজা থেকেই তাঁরা বঞ্চিত হন ।

পাহাড়ের গা ঘেঁষে যে দীর্ঘ পথটি চলে গেছে, তার শুরু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়ার স্প্রিংগার মাউন্টেনের কোলে । আর সেই মনভোলানো পথ শেষ হয়েছে মেইনের রেনবো হ্রদের লাগোয়া মাউন্ট কাটাহ্‌ডিন-এ । স্প্রিংগার মাউন্টেন থেকে বেরিয়ে পড়ার ঠিক সময় হল বসন্তকাল, কারণ সমগ্র অভিযানটি শেষ করে যখন মেইনে আসে, তখন সেখানে গরমের তীব্রতাও বেশ কমে যায় ।

১৯২১ সালে একটি পত্রিকায় প্রকৃতিবিজ্ঞানী ম্যাককের একটি মূল্যবান নিবন্ধ প্রকাশিত হয় । সেখানে তিনি লিখেছিলেন, পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘ, প্রায় ২১০০ মাইল লম্বা এই পাহাড়ি পথের কয়েকটি জায়গায় যদি সেতুবন্ধন করা যায়, তা হলে সারা দেশের অসংখ্য প্রকৃতিপ্রেমিক এর সীমাহীন সৌন্দর্য উপভোগ করার সুযোগ পাবেন । ম্যাককের পরামর্শমতো পরের বছর থেকেই শুরু হয়ে গেল কাজ । জর্জিয়া থেকে টেনেসি, উত্তর ক্যারোলিনা, ভার্জিনিয়া মেরিল্যান্ড, পেনসিলভেনিয়া, নিউ জার্সি, কানেকটিকাট, ম্যাসাচুসেটস, নিউহ্যাম্পশায়ার হয়ে মেইন প্রদেশের মাউন্ট কাটাহ্‌ডিন-এর বুকে শেষ হল পৃথিবীর বৃহত্তম পাহাড়ি পথ ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে, ১৯৪৮ সাল থেকে শুরু হয় অ্যাপালাসিয়ান ট্রেইলে মানুষের যাতায়াত । তারপর থেকেই এখানে বারবার ছুটে এসেছেন অসংখ্য প্রকৃতিপ্রেমী । ১৯৭৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার ন' কোটি ডলার মূল্যে আপ্যালাসিয়ান ট্রেইলের একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড (করিডর) কেনার জন্য বিল অনুমোদন করেন ।

এরা এসেছে অভিযানের নেশায়

নির্জন পথে সাহসী অভিযাত্রী

সমগ্র যাত্রাপথের সৌন্দর্য দু-এক কথায় লিখে বোঝানো অসম্ভব। এর জন্য চাই একটি নির্ভেজাল সৌন্দর্যপিয়াসী মন আর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। চলতে-চলতে পথ পৌঁছয় ব্লাড মাউন্টেন, ঘন জঙ্গল, লম্বা একটা পাইন গাছের নীচে পথ যেন থমকে গেছে। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে বেরিয়েছে পথ। পাহাড় কেটে-কেটে চড়াই-উতরাই হয়ে তা মিলিয়ে গেছে প্রকৃতির কোলে।

আরও এগিয়ে টেনেসি আর উত্তর ক্যারোলিনার ন্যাড়া পাহাড়ে রঙের বৈচিত্র্যের মধ্যে চোখে পড়ে উঁচু রাস্তার দু' পাশে ঘাস আর নলখাগড়ার সারি বাতাসে মাথা দোলাচ্ছে। দু'ধারে চাষের জমি আর মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট বাড়ি, তারও পেছনে যতদূর দৃষ্টি যায় পাহাড়ের কোলে ছবির মতো সব ছোট-ছোট উপত্যকা।

দু'দিকে দড়ি টাঙিয়ে হ্রদ পেরনোর সুন্দর কৌশল

গ্রেট স্মোকি মাউন্টেন ন্যাশনাল পার্কের মধ্য দিয়ে উত্তর ক্যারোলিনা আর টেনেসির সীমান্ত ধরে ৭০ মাইল বিস্তৃত অ্যাপালাসিয়ান ট্রেইলের সবচেয়ে উঁচু চুড়ো ক্লিনগম্যানস্ ডোম। এর উচ্চতা ৬৬৪৩ ফুট। উত্তর ইউরোপের তুলনায় এখানে অনেক বেশি প্রজাতির গাছ ও ফুল পাওয়া যায়। আর আছে প্রচুর বুনো ভালুক। কিন্তু এরা মানুষের কোনও ক্ষতি করে না।

পথে পড়ে ভার্জিনিয়া। নীল গিরিশিরা বেয়ে পথ এগিয়ে চলে। আলো-ঝলমলে প্রকৃতি দেখে পর্যটক মুগ্ধ হয়ে যান। শেনানডোয়া নদীর তীরে ছেয়ে আছে গাঢ় পশমের মতো ঘন বন। একটু এগিয়ে পড়ে হারপারসফেরি, যেখানে অ্যাপালাসিয়ান ট্রেইল কনফারেন্স হেড কোয়ার্টার্স রয়েছে। এর পর মেরিল্যান্ডকে পেছনে ফেলে পর্যটক পৌঁছে যান পেনসিলভেনিয়ায়। লক্ষ করলে দেখা যাবে জর্জিয়ায় রাস্তার দু'পাশে ঘন জঙ্গল। আবার ভার্জিনিয়ায় লম্বা রাস্তা মেরিল্যান্ডে গিয়ে অনেক ছোট হয়ে গেছে, সেখানে পেনসিলভেনিয়ায় রাস্তা উঁচু-নিচু এবড়ো-খেবড়ো পাথরে ভর্তি।

নিউ জার্সি, নিউ ইয়র্ক আর ম্যাসাচুসেটস পৌঁছে কয়েক মাইল এগোলেই শোনা যাবে গ্রেমুর গুম্ফার সান্ধ্যকালীন প্রার্থনা। সঙ্গীত আর ঘণ্টাধ্বনি। এখানে এলে পর্যটক আর সন্ন্যাসীদের জীবনযাত্রায় কোথায় যেন একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

ভারমন্টের বিস্তীর্ণ প্রান্তর ধরে বিচ, মেপ্‌ল ও হোয়াইট বার্চের জঙ্গল পেরিয়ে যাত্রাপথ নিউহ্যাম্পশায়ার হোয়াইট মাউন্টেনে এসে থেমেছে। মাউন্ট মুশিলক ও মাউন্ট ওয়াশিংটনের ঝোড়ো হাওয়ার মধ্য দিয়ে পর্যটক এসে পৌঁছন মাউন্ট ম্যাডিসনে। উত্তরমুখী যাত্রাপথ এগিয়ে চলে মেইন প্রদেশে। এখানে চারপাশে আছে বিশাল-বিশাল হ্রদ। কেনবেক নদী পার হওয়ার জন্য মোটর বোট ভাড়া পাওয়া গেলেও বেশির ভাগ যাত্রীই ভাড়া বাঁচাবার জন্য পায়ে হেঁটে নদী পার হন। সবচেয়ে কঠিন ও পরিশ্রমের কাজ হল এই মেইন-এর পথ পেরনো। বিখ্যাত রেনবো হ্রদ সাঁতরে, সরু তারের সেতু পেরিয়ে পর্যটকরা স্পর্শ করেন অ্যাপালাসিয়ান ট্রেইলের শেষ প্রান্তর মাউন্ট কাটাহ্ডিন। পথের বিশাল ব্যাপ্তি, নির্জনতার সৌন্দর্য সবকিছুই মনকে আবিষ্ট করে তোলে।

ফোটো : ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক-এর সৌজন্যে

অস্ট্রেলিয়ার জাদুকর

সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের সর্বাধুনিক জাদুঘর 'পাওয়ারহাউস'-এর উদ্বোধন করা হল সিডনিতে। জাদুঘরের মূল বাড়িটি আগে ট্রাম ও ট্রেনের বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র ছিল। পাঁচ কোটি অস্ট্রেলীয় ডলার খরচ করে বাড়িটিকে জাদুঘরের উপযুক্ত করে তোলা হয়েছে। এই জাদুঘরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে গত দু'শো বছরে অস্ট্রেলীয় সংস্কৃতির বিবর্তনের ধারাকে উপস্থাপিত করা হয়েছে।
এখানে রয়েছে পৃথিবীর প্রাচীনতম বাষ্পচালিত এঞ্জিন—১৭৮৫ সালের বোল্টন অ্যান্ড ওয়াট, রয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্যাটালিনা ফ্লাইংবোট—পৃথিবীর আর কোনও জাদুঘরে এত বড় মাপের বিমান ঝুলন্ত অবস্থায় প্রদর্শিত হয়নি। এ ছাড়া রয়েছে নানা বিচিত্র রঙের হলোগ্রাম।

ডাইনোসরের ডিম

সাড়ে চোদ্দ কোটি বছরের পুরনো অবিকৃত একটি ডাইনোসরের ডিম পাওয়া গেছে। পরীক্ষা করে জানা গেছে, উত্তর গোলার্ধে এ-পর্যন্ত যত ডাইনোসরের ডিম আবিষ্কৃত হয়েছে এটি তার মধ্যে প্রাচীনতম। হল-এর এই আবিষ্কার পরীক্ষা করে দেখেছেন কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়াম অ্যাসোসিয়েট প্রখ্যাত ডিমের খোলার জীবাশ্ম বিশেষজ্ঞ কার্ল

হার্শ।
হার্শ বলেছেন, ডিমের খোলাটিতে একটির বদলে দু-দু'টি আবরণ পাওয়া গেছে। এর অর্থ হল, ডিম পাড়ার সময় মা-ডাইনোসরকে কোনওভাবে কেউ বিরক্ত করেছিল। ফলে ডিমটা না পেড়ে সেটা শরীরের ভেতরেই রেখে দিতে বাধ্য হয়েছিল সে। তখন ডিমটার ওপরে দ্বিতীয় একটি আবরণের সৃষ্টি হয়।
বর্তমান কালের বেশ কিছু সরীসৃপের ডিমে এরকম একাধিক আবরণ লক্ষ করা গেছে। এর কারণ, মায়ের অপুষ্টি অথবা ডিম পাড়ার সময় কেউ তাকে বিরক্ত করেছিল। হার্শের ধারণা, কোনও জলার মধ্যে আটকে গিয়ে মা-ডাইনোসরটি মারা গেছে। আর সেই সঙ্গে ডিমটিও নষ্ট হয়ে গেছে।

গাড়ির বিনোদন-ব্যবস্থা

ডিস্কম্যান

আমেরিকার সনি কর্পোরেশন বের করেছে তিন রকমের ডিস্কম্যান : গাড়িতে ব্যবহারের উপযুক্ত পোর্টেবল কমপ্যাক্ট ডিস্ক প্লেয়ার। রেকর্ড করা শব্দের প্রত্যেকটি

সুমেরীয়রা ইউরেনাস ও নেপচুনকে যমজ বর্ণনা করেছিল। এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করল ভয়েজারের পাঠা

ইউরেনাস ও নেপচুনের রহস্য

১৯৭৭ সালে মহাকাশচারীহীন মহাকাশযান ভয়েজার-২ রওনা হয়েছিল। দু'শো পঁচাত্তর কোটি মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে নেপচুনের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল গত বছরে। সেখান থেকে আলোর গতিতে বহু তথ্য ও ছবি পাঠিয়েছে ভয়েজার। আর সেই প্রথম মানুষ অন্তরঙ্গ ভাবে দেখতে পেল নেপচুনকে। এই অভিজ্ঞতা 'নাসা'র বিজ্ঞানী-শিবিরে ভীষণ আলোড়ন তুলেছে।
ক্যালিফোর্নিয়ার জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরির যে-সব বিজ্ঞানী ভয়েজার প্রকল্পের তত্ত্বাবধানে ছিলেন, তাঁদের ঘুম উড়ে গেল। দেখা গেল, নেপচুনের রং উজ্জ্বল নীল, আর তার মাঝে-মাঝে সাদা রেখার এক-একটা টান। আর গ্রহটির অক্ষ অপ্রত্যাশিতভাবে একপাশে হেলানো। অর্থাৎ, নেপচুনের জোরালো চৌম্বকক্ষেত্র রয়েছে, ভেতরে রয়েছে অসম্ভব তাপ, আর শাঁসটি তরল।
ইউরেনাস ও বৃহস্পতির তথ্য ভয়েজার-২ আগেই পাঠিয়েছিল। এখন নেপচুনের তথ্য পাঠানোর ফলে সৌরজগৎ সম্পর্কে আমাদের ধারণা অনেকটাই বদলে গেল।

কিন্তু সত্যিই কি তাই ? পরিচিত ভাষাবিদ ও বাইবেল গবেষক জাকেরিয়া সিটচিনের অভিমত হল ভয়েজারের পাঠানো তথ্য ১৯৭৬-এ প্রকাশিত তাঁর বই 'দ্য টুয়েলফথ প্ল্যানেট' এর ভবিষ্যদ্বাণীকেই প্রমাণ করেছে। অর্থাৎ, ভবিষ্যদ্বাণীগুলো তিনি করেছিলেন ভয়েজার মাটি ছাড়ার আগেই। সিটচিনের মতে এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল ৬০০০ বছর আগে প্রাচীন সুমেরীয়রা নেপচুন সম্পর্কে যে-সব তথ্য লিপিবদ্ধ করে গিয়েছিল ভয়েজারের তথ্য সেগুলোই স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন করেছে।
খ্রিস্টের জন্মের প্রায় চার হাজার বছর আগে দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় (বর্তমান ইরাক) সুমেরীয় সভ্যতার সূচনা হয়েছিল। সিটচিন বলেছেন, এই প্রাচীন সভ্যতা চাকা, ভাঁটি ও চাষবাসের জন্য জলসেচের প্রণালী আবিষ্কার করেছিল। এমনকী, জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণও শুরু করেছিল তারা। যাবতীয় আবিষ্কারের তথ্য সুমেরীয়রা নথিবদ্ধ করেছিল নানা চিত্র ও চিত্রলিপির সাহায্যে। পাথরের সিলিণ্ডারের ওপরে এইসব চিত্র ও লিপি তারা এমনভাবে উলটো করে খোদাই করেছিল যাতে সিলিণ্ডারটিকে ভিজে মাটির ওপরে এক পাক গড়িয়ে দিলে সঠিক ছাপটি ফুটে ওঠে। এই জিনিসগুলোকে বলা হয় সিলিণ্ডার সিলমোহর।
সুমেরীয়দের বিভিন্ন জিনিস নিয়ে প্রায় তিরিশ বছর ধরে গবেষণা করেছেন সিটচিন। এই অনুসন্ধানের কাজে তিনি পূর্ব বার্লিনের স্টেট মিউজিয়াম থেকে একটি আশ্চর্য সিলিণ্ডার সিলমোহর পেয়েছেন। সিলমোহরে আঁকা রয়েছে আকাশের ছবি। ছবির কেন্দ্রস্থলে রয়েছে ভাস্বর সূর্য, আর তাকে ঘিরে অন্যান্য গ্রহ—যেভাবে গ্রহদের আমরা আজ জানি, ঠিক সেইমতো তাদের মাপ ও সঠিক অবস্থান। তবে সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ে মোট সংখ্যা বারো। এই সময়কার অন্যান্য ফলক ও সিলমোহর ঘেঁটে সিটচিন গ্রহের একটি তালিকা পেয়েছেন। তালিকার সর্বপ্রথম গ্রহটি সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থিত। এইসব অত্যাশ্চর্য তথ্য সিটচিন 'দ্য টুয়েলফ্থ্ প্ল্যানেট' ও তার পরবর্তী দুটি অনুগামী গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ১৯৮৬-র জানুয়ারিতে ভয়েজার যখন ইউরেনাসের তথ্য পৃথিবীতে পাঠাল তখনই বিপদ সংকেত বেজে উঠল সিটচিনের মাথায়। সুমেরীয় বর্ণনার সঙ্গে ভয়েজারের তথ্য আশ্চর্যভাবে মিলে যাচ্ছে। ঠিক একইভাবে মিলে যাচ্ছে নেপচুনের বর্ণনা। সুমেরীয়রা ইউরেনাস ও নেপচুনকে যমজ হিসেবে বর্ণনা করেছিল। ভয়েজারের পাঠানো তথ্য এই সিদ্ধান্তকেও সমর্থন করল। কারণ, দেখা গেল, দুটি গ্রহেরই রং উজ্জ্বল নীল, দুটিরই শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্র রয়েছে,

বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে ডিস্কম্যান ব্যবহার করেছে ওভারস্যাম্পলিং ডিজিটাল ফিলটার ও একজোড়া ডিজিটাল-টু-অ্যানালগ কনভার্টার। এ ছাড়া বিভিন্ন শব্দময় পরিবেশে কমপ্যাক্ট ডিস্ক থেকে জুতসই আওয়াজ পেতে ডিস্কম্যানে রয়েছে আধুনিক ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেসিং-এর ব্যবস্থা। মাপে ছোট হালকা ডিস্কম্যান গাড়ির ঝাঁকুনিতেও 'বিচলিত' হয় না—নিখুঁত ভাবে শুনিয়ে যায় তার সঙ্গীত। ডিস্কম্যানের বিভিন্ন ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যাতে দিনে বা রাতে সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় তার জন্য বিশেষ ইলেকট্রনিক বাতির আয়োজন। ডিস্কম্যানের গুণগত মান নিয়ে সন্দেহের কোনও প্রশ্ন নেই, কারণ সনি কর্পোরেশনই প্রথম কমপ্যাক্ট ডিস্ক ও কমপ্যাক্ট ডিস্ক প্লেয়ার পৃথিবীবাসীকে উপহার দিয়েছিল।

ক্যামকর্ডার

নতুন ধরনের আট মিলিমিটার ভিডিও ক্যামেরা ও রেকর্ডার, ক্যামকর্ডার, বের করেছে ক্যানন কম্পানি। এতে রয়েছে মালটিফাংশান অটো ফ্রেমিং নামের এক অভিনব ব্যবস্থা। এর ফলে ছবির চৌকোনো মাপ একই রেখে ছবির বিশেষ কোনও অংশকে বিবর্ধিত করা যায়। ছবির কোনও মানুষ যদি ক্যামেরার দিকে এগিয়ে আসে অথবা ক্যামেরা থেকে দূরে সরে যায়, তাতেও কোনও অসুবিধে নেই। একই প্রক্রিয়ায় তার ছবিও মাপে বড় করে নেওয়া যায়। এ ছাড়া এর মধ্যে রয়েছে ক্যারেক্টার জেনারেটর ও ডিজিটাল সুপারইমপোজার। এর সাহায্যে দিনক্ষণ ইত্যাদি স্বয়ংক্রিয় ভাবে চলে আসে ভিডিও ফিল্মে। ক্যানন ক্যামকর্ডারের হাই-স্পিড শাটার চার রকমভাবে কাজ করে, আর শাটার কাজ করতে সময় লাগে মাত্র এক সেকেন্ডের বারোশো ভাগের এক ভাগ।

ক্যানন ক্যামকর্ডারের সঙ্গে রয়েছে ওয়্যারলেস রিমোট কন্ট্রোল। এর সাহায্যে ভিডিও ক্যামেরার জুম লেন্সের ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আর তোলা ছবি চালিয়ে দেখার কাজটাও হয়ে যায় সহজ।

থ্য ....

রয়েছে অসংখ্য উপগ্রহ, উত্তপ্ত তরল গ্যাঁস, আর গ্রহপৃষ্ঠে পাওয়া গেছে প্রচুর জল।
ইউরেনাস ও নেপচুন খালি চোখে দেখা যায় না। তা হলে টেলিস্কোপ বা কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্য ছাড়াই সুমেরীয়রা এই দুটি গ্রহ সম্পর্কে এত তথ্য জানল কেমন করে! এই প্রশ্নের উত্তরে এক অদ্ভুত কথা বলেছেন সিটচিন: বার্লিনের সিলমোহরে বৃহস্পতি ও মঙ্গলের মাঝে যে-দশম গ্রহটি দেখানো হয়েছে সেই গ্রহের বাসিন্দারা যোগাযোগ করেছিল সুমেরীয়দের সঙ্গে। তিন হাজার বছরে বহুবারই তারা পৃথিবীতে এসেছে। বহু প্রাচীন পুঁথিতে এর উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু নাসা-র বিজ্ঞানী অ্যান্ডু চেঙ-এর মত অন্যরকম। ভয়েজার-২ মিশনের বিজ্ঞানী দলের অন্যতম চেঙ বলেছেন: নেপচুন আর ইউরেনাসকে যমজ বলা যায়। তবে এই দুটি গ্রহে জল পাওয়াটা কোনও আশ্চর্য ব্যাপার নয়। আর মঙ্গল ও শুক্র ছাড়া বাকি সব ক'টি গ্রহেরই তরল গ্যাঁস রয়েছে।
নেপচুন-ইউরেনাসে চৌম্বক ক্ষেত্রও যে থাকবে তা অনেক আগেই অনুমান করা গিয়েছিল। আর গ্রহ দুটির রংও আমরা অনেক আগে থেকেই জানতাম। দশম গ্রহ সম্পর্কে চেঙ-এর বক্তব্য: সম্প্রতি কয়েকজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী প্ল্যানেট-এক্স-এর সম্ভাবনার কথা বলেছেন। এই গ্রহ যদি সত্যি থাকেও তা হলেও তাতে প্রাণ সৃষ্টির সম্ভাবনা নেই—কারণ গ্রহটি সূর্য থেকে বহু দূরের কক্ষপথে রয়েছে।
এদিকে নোত্রদাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত সুমেরীয় সভ্যতা বিশারদ ফ্রান্সেসকা রোশবার্গ-হ্যালটন বলেছেন: সিটচিনের দাবি আজগুবি। সুমেরীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান বলে কোনওদিনও কিছু ছিল না। কিন্তু সিটচিন নিজের সিদ্ধান্তে অনড়। তাঁর কথায়: সম্পূর্ণ কাকতালীয় ভাবে এত ভবিষ্যদ্বাণী কখনও মিলতে পারে না।

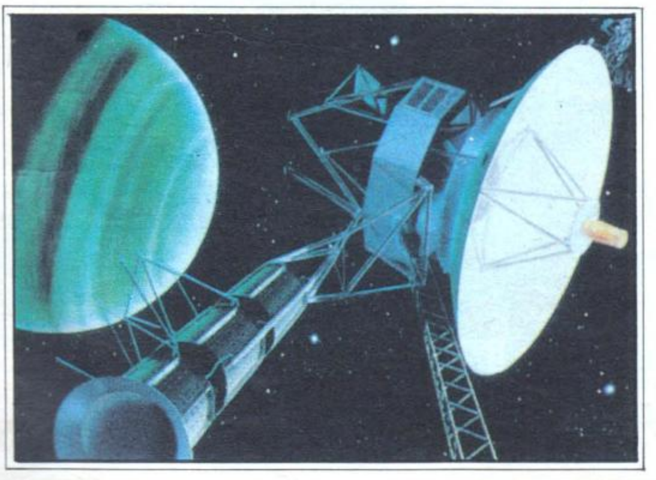

প্রচ্ছদকাহিনী

এক দশকের সেরা চমক

পৃথিবীর সবচেয়ে মোটা মানুষের নাম কী ? কোন মহিলার মাথার চুল সবচেয়ে লম্বা ? বিশ্বের সবচেয়ে বড় স্টেডিয়ামটি আছে কোথায় ? কত দর্শক ধরে সেখানে ? মাথায় বোতল নিয়ে হেঁটে বিশ্বরেকর্ড করেছেন কে ? পৃথিবীর নানা ক্ষেত্রে প্রায়ই তৈরি হচ্ছে এ-ধরনের নানা রেকর্ড । এবং এই রেকর্ড সঙ্কলনের কাজটিও রীতিমত চমকপ্রদ । এইসব আজব কীর্তিকলাপ ও বিজ্ঞানের চমক-জাগানো সৃষ্টি নিয়ে লিখেছেন অভীক মজুমদার

সেদিন শনিবার । সার হিউজ বিভার (১৮৯০-১৯৬৭) বেরিয়েছেন সঙ্গীদের নিয়ে আয়াল্যান্ডের স্ল্যানি নদীর পাশে নর্থ স্লবে শিকার করতে । ১৯৫১ সাল, নভেম্বর মাসের ১০ তারিখ । বেশ ভালই চলছিল সেদিনের শিকার,কিন্তু ফেরার পথে হঠাৎ মাথার ওপর দিয়ে কয়েকটা গোল্ডেন প্লোভার পাখি এত দ্রুত উড়ে গেল, একটাকেও বন্দুকের গুলি ছুঁতে পারল না । সেদিন সন্ধেবেলা এ-প্রসঙ্গে সকলে কথা বলতে-বলতে বুঝলেন, এ-কথা কিছুতেই জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না, যে গোল্ডেন প্লোভার ইউরোপের দ্রুততম পাখি । ১৯৫৪

বিশ্বের সবচেয়ে বেঁটে যমজ ভাই । নাম জন রাইস ও গ্রেগ রাইস । এক একজনের উচ্চতা প্রায় আড়াই ফুট ।

পৃথিবীর সবচেয়ে বেঁটে মানুষ নেলসন ডে লা রোভ্যা অ্যাকুইনো । দৈর্ঘ্য মাত্র ৭২ সেন্টিমিটার ।

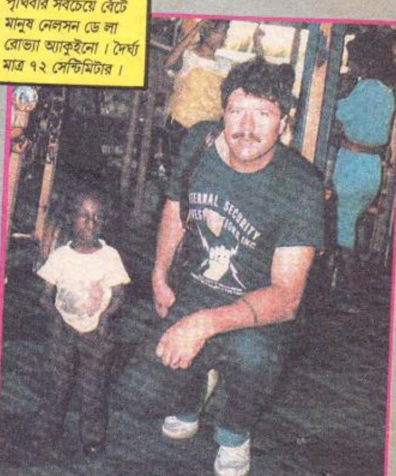

প্রায় ২০ কিমি দু' চাকার ওপর গাড়ি চালিয়েছেন সুইডেনের কেনেথ এরিকসন ।

আগুনের ওপর দিয়ে হাঁটছে মেয়েটি। আগুনের গড় তাপমাত্রা ৮৪১ ডিগ্রি ফারেনহাইট।

জর্জিয়া সেত্রানিক। লম্বা চুলের প্রতিযোগিতায় ইনিও পিছিয়ে নেই।

দীর্ঘদেহী বাস্কেটবল খেলোয়াড় আমেরিকার করিম আব্দুল জব্বর।

বরফের প্রাসাদ। মিনেসোটার সেন্ট পল-এ শীতের এক উৎসবের শতবর্ষে এটি তৈরি করা হয়েছিল।

মানুষ-মৌচাক ম্যাকস বেক! এক লাখ মৌমাছি, যাদের ওজন ১২·৪ কেজি, মানুষটির গায়ে বসেছে।

সবচেয়ে বড় চামচ, উচ্চতায় ৬ ফুট ৮ ইঞ্চি। সবচেয়ে বড় কাঁটা, উচ্চতায় ৭ ফুট ৩/৪ ইঞ্চি।

পঁচাত্তর খণ্ডের 'কেমিক্যাল অ্যাবস্ট্র্যাক্টস'। উচ্চতায় সাড়ে ১৪ ফুট, ওজন ১৭২,৩ কেজি। পরপর সাজালে উচ্চতম সূচকগ্রন্থ এটাই।

সালের অগস্ট মাসে এ-বিষয়ে বিতর্ক জমে উঠল। কেউ-কেউ বললেন না, গ্রাউসই দ্রুততম পাখি। সার হিউজ, যিনি গিনেস প্রকাশন সংস্থার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ছিলেন তখন, ভাবলেন তা হলে নিশ্চয়ই আরও অসংখ্য বিষয় আছে, যেগুলি নিয়ে দিনের পর দিন সকলে তর্ক করে চলেছে, কিন্তু কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছে না। এরকম কোনও বিশ্বাসযোগ্য রেকর্ডবুক তো নেই! ১৯৫৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বর সার হিউজ, নরিস আর রস ম্যাক হুয়িরটারকে আমন্ত্রণ জানালেন, যদি তাঁদের তথ্য ও পরিসংখ্যান

দোতলা সাইকেল? এটি তৈরি করেন ওসাকার কেসাইচিরো তাগাওয়া। লম্বায় এটি ১৬·৪ ফুট, দোতলার হ্যান্ডেল পর্যন্ত উচ্চতা ১১·১ ফুট।

সংস্থা এ-বিষয়ে কোনও সাহায্য করতে পারেন। লন্ডনের ১০৭ নম্বর ফ্লিট স্ট্রিটে অফিস খোলা হল। সারাদিন প্রচুর কর্মব্যস্ততা, সকলেই কাজে ডুবে গেলেন এমন একটি নিখুঁত রেকর্ডবুক তৈরি করতে। অবশেষে ১৯৫৫ সালের ২৭ অগস্ট প্রকাশিত হল গিনেস বুক অব রেকর্ডস-এর প্রথমটি। তারপর এর আমেরিকান সংস্করণ প্রকাশিত হল ১৯৫৬-তে, প্রকাশিত হতে লাগল ফরাসি (১৯৬২) আর জার্মান (১৯৬৩) সংস্করণ। ১৯৬৭ সালে জাপান, স্পেন, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইজারল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, ইতালি—সর্বত্র এই বইয়ের প্রথম অনূদিত সংস্করণ প্রকাশিত হল। ধীরে-ধীরে সাত-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এর সঙ্গে যোগ হল হল্যান্ড, পর্তুগাল, চেকোস্লোভাকিয়া

একসঙ্গে ২৬টি ইট তুলেছেন জিওফ কেপ্‌স, তারিখ ১৬ জুন, ১৯৮৮।

রোলার স্কেটিং-এ বিশ্বরেকর্ড করেন কেলি ফলি। বিশ্বের অন্যতম বিস্ময় এই মানুষটি।

সবচেয়ে মোটা মানুষ

চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে এ পর্যন্ত স্থূলতম যে মানুষটির নজির রয়েছে, তাঁর নাম জন বাওয়ার মিনোখ (জন্ম : ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪১)। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার ওয়াশিংটন স্টেটের বাসিন্দা এই ভদ্রলোকের ওজন ছিল ৬৩৫ কিলোগ্রাম। বহু চিকিৎসায় তাঁর ওজন কমানো হয় এবং ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন মারা যান তখন তাঁর ওজন ছিল ৩৬৩ কিলোগ্রাম! জীবিত স্থূলতম মানুষ টি· জে· অ্যালবার্ট জ্যাকসনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। এঁর ওজন সম্প্রতি নেওয়া হয়েছে। দেখা গেছে, এঁর ওজন ৪০৪ কিলোগ্রাম! ছাতি ১২০ ইঞ্চি, কোমর ১১৬ ইঞ্চি, উরু ৭০ ইঞ্চি এবং ঘাড় সাড়ে ২৯ ইঞ্চি! নীচের ছবিটি আমেরিকার ওয়াল্টার হাডসন-এর। ওজন প্রায় ৫৩০ কেজি। দরজায় একবার আটকে গিয়েছিলেন।

প্রভৃতি দেশের সংস্করণ। আট-এর দশকে গ্রিক, চিনে, হাঙ্গারিয়ান, তুর্কি, হিন্দি, আরবিক, মলয়ালম প্রভৃতি আরও অনেক ভাষায় এই বই প্রকাশিত হতে থাকল। ১৯৮৯ সাল থেকে রুশ ভাষাতেও এই বই দেখতে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ প্রতি বছর সব মিলিয়ে ৩৬টি ভাষায় ২৬২টি সংস্করণ হয় 'গিনেস বুক অব রেকর্ডস'-এর। ১৯৭৪ সাল থেকে গিনেস বুক অব রেকর্ডসে বইটি নিজেই জায়গা করে নিয়েছে। প্রকাশনার ইতিহাসে গিনেস বুক একটি বিস্ময়! প্রতি বছর এর বিক্রি সবচেয়ে বেশি। প্রতি সংখ্যাই প্রায় ২৩·৯ মিলিয়ন বিক্রি হয়। প্রতিটি সংখ্যাই বেস্ট সেলার। কর্তৃপক্ষ আশা করছেন ১৯৯০-র অক্টোবরে এর বিক্রি গিয়ে দাঁড়াবে ৬০ মিলিয়নেরও বেশি। অর্থাৎ ১৬৮ টি লম্বা-লম্বা বইয়ের পাহাড়, যার প্রতিটি মাউন্ট এভারেস্টের চেয়েও উঁচু! মানুষের জীবনে অনেক অবিস্মরণীয় ঘটনা ঘটে, অনেকের জীবনের নানা অভিজ্ঞতাও রোমাঞ্চকর। এইসব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে-যেতে অজান্তে অনেকে রেকর্ড সৃষ্টি করে ফেলেন। তেমন কয়েকটি নজিরের দিকে তাকানো যেতে পারে। অনেকে আবার, গিনেস বুকে স্থান পাওয়ার জন্য অস্বাভাবিক কাজকর্ম করেন বা বর্তমান রেকর্ডকে ভাঙতে নানা অদ্ভুত অভ্যাস চালিয়ে যান। পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা গোঁফ বর্তমানে সুইডেনের বার্জর পেল্লাসের (জন্ম : ১৯৩৪)। গোঁফের দৈর্ঘ্য শুনলে চমকে যেতে হয়, ১৯৮৯ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি তাঁর গোঁফ মেপে দেখা যায়, সেটি ন'ফুট ৪ ১/২ ইঞ্চি (২৮৬ সেমি) লম্বা! সবচেয়ে দীর্ঘদিন হাসপাতালে ছিলেন মিস মার্থা নেলসন। ১৮৭৫ সালে আমেরিকার ওহিও হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হয়। ১৯৭৫ সালে, ১০৩ বছর বয়সে তিনি ওই হাসপাতালেই মারা যান। অর্থাৎ ওহিও হাসপাতালে তিনি ছিলেন ৯৯ বছর! রয় সি সুলিভানের জীবনের ঘটনাও মনে রাখবার মতো। আমেরিকান এই ভদ্রলোকের ওপর সাতবার বজ্রপাত হওয়া সত্ত্বেও তিনি বেঁচে আছেন। এই বজ্রপাতগুলি হয়, যথাক্রমে ১৯৪২, ১৯৬৯, ১৯৭০, ১৯৭২, ১৯৭৩, ১৯৭৬ এবং সব শেষে ১৯৭৭ সালে। পঞ্চমবার বজ্রপাতের পর তিনি বলেছেন, "এবার বজ্রপাতে আমার টুপি পুড়ে গেল, চুলে আগুন ধরে গেল, তারপর শরীরের বাঁ দিক দিয়ে বয়ে গেল প্রবল এক শিহরন। বাঁ পায়ের জুতো ছিটকে গেল, তারপর ডান পায়ে তীব্র যন্ত্রণা শুরু হল।"

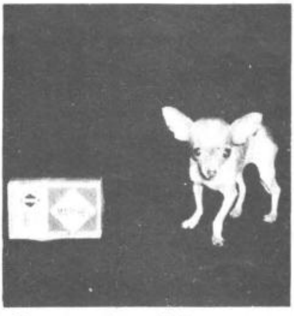

জীবিত সবচেয়ে ছোট কুকুর 'পিনাট্‌স'

জীবজন্তুর জগতেও প্রকৃতির খেয়ালে গড়ে ওঠে নতুন নতুন নজির, কখনও আবিষ্কৃত হয় রেকর্ড হিসেবে গৃহীত কোনও অজানা তথ্য। সবচেয়ে ছোট কুকুর 'পিনাট্‌স' যে আসলে চিহুয়াহুয়া প্রজাতির ক্ষুদ্র সংস্করণ। এখন এই কুকুরটি রয়েছে আমেরিকার নর্থ ক্যারোলিনার, পার্কার পরিবারে। মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত এর দৈর্ঘ্য ২৫ সেমি, ওজন সাড়ে ছ'শো গ্রাম। বিষাক্ত মাছ স্টোনফিশ দেখা যায় ভারতীয় প্রশান্ত মহাসাগরে, বিশেষত 'সিনাসেজা-হরিডা' অঞ্চলে। এর পাখনা এবং আঁশে নিউরোটক্সিক বিষ এত তীব্র যে একবার শরীরে প্রবেশ করলে মৃত্যু নিশ্চিত। প্রাকৃতিক জগতে রয়েছে নানা ধরনের রেকর্ড। পৃথিবীর উচ্চতম এবং এখনও

ক্রেমলিনের সেই ভারী ঘণ্টা

ভারী ঘণ্টা

পুজো করার সময় ছোট-ছোট ঘণ্টা হাত দিয়ে তুলে অনায়াসে বাজাতে দেখা যায় পুরোহিতদের। বড়-বড় মন্দির আর গির্জায় বিশাল-বিশাল ঘণ্টাও চোখে পড়ে। কিন্তু বিশ্বের সবচেয়ে ভারী ঘণ্টার তুলনায় সেগুলো কিছুই নয়। এই ঘণ্টাটি আছে মস্কো শহরের ক্রেমলিনে। জার কলোকল এই ঘণ্টা তৈরি করিয়েছিলেন ১৭৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২৫ নভেম্বর। এর ওজন ১৯৬ টন। এই ঘণ্টাটির ব্যাসার্ধ ১৯ ফুট ৪ ২/৩ ইঞ্চি, উচ্চতা ১৯ ফুট ৩ ইঞ্চি। এর একটি অংশ ভেঙে গেছে, যার ওজন ১১ টন। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে মস্কোয় এই ঘণ্টাটি রাখা আছে।

সক্রিয় আগ্নেয়গিরি-র নাম ওজোস ডেল সালাদো। চিলি আর আর্জেন্টিনার মধ্যে সীমান্ত-প্রাচীর তৈরি করেছে এই আগ্নেয়গিরি। উচ্চতা : ৬৮৮৫ মিটার (২২,৫৮৮ ফুট)। অন্য দিকে তীব্রতম ভূমিকম্প হয় ১৯৬০ সালে চিলিতে। আর সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা গেছে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের তাংসান ভূমিকম্পে চিনদেশে। এই ভূমিকম্পে সরকারি হিসেবমতো মারা গিয়েছিল ২৪২০০০ জন মানুষ।

প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের লড়াই বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে। সময় যতই এগোচ্ছে, মানুষ উদ্ভাবন করছে প্রকৃতিকে জয় করবার নতুন-নতুন যন্ত্রপাতি, নতুন কারিগরি-বিদ্যা।

মনে রাখবার মতো কয়েকটি ভূমিকম্প

স্থান	তারিখ
ইকুয়েডর	৩১ জানুয়ারি ১৯০৬
কামচাটকা, সোভিয়েত রাশিয়া	৪ নভেম্বর ১৯৫২
অ্যানড্রিয়ানোল, আমেরিকা	৯ মার্চ ১৯৫৭
আলাস্কা, আমেরিকা	২৮ মার্চ ১৯৬৪
চিলি	২২ মে ১৯৬০

মহাকাশও আজ এসে গেছে হাতের মুঠোয়। দীর্ঘতম সময় মহাকাশে কাটানোর রেকর্ড করেছেন রাশিয়ার নভোচারী ভ্লাদিমির

৭ ফুট ৭ $\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি লম্বা মহিলা স্যান্ডি অ্যালেন

সবচেয়ে লম্বা, সবচেয়ে বেঁটে

এই মুহূর্তে পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা পুরুষের নাম গ্যাব্রিয়েল এস্তাভাও মনজানে। এঁর জন্ম ১৯৪৪ সালে। বাড়ি পূর্ব আফ্রিকার মোজাম্বিকে। উচ্চতা ২৪৫·৭ সেন্টিমিটার অর্থাৎ ৮ ফুট $\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি। যখন এঁর বয়স ষোলো, তখনই এঁর উচ্চতা ছিল ২২৬ সেন্টিমিটার (৭ ফুট ৫ ইঞ্চি)।

সবচেয়ে লম্বা মহিলা স্যান্ডি অ্যালেন, থাকেন শিকাগো শহরের কাছে। এখন স্যান্ডির উচ্চতা ২৩১·৭ সেন্টিমিটার অর্থাৎ ৭ ফুট ৭ $\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি।

উলটো দিকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেঁটে মানুষ ডমিনিকান রিপাবলিকের নেলসন ডে লা রোসা অ্যাকুইনো। এঁর জন্ম ১৯৬৮ সালে। বর্তমান উচ্চতা মাত্র ৭২ সেন্টিমিটার, মানে প্রায় ২৯ ইঞ্চি।

সবচেয়ে লম্বা যমজ হিসেবে মাইকেল আর জেমস লেনিয়ার-এর নামও মনে রাখা দরকার। এই দুই ভাইয়ের শারীরিক মিল নিখুঁত। দু'জনেই ২১৬ সেন্টিমিটার (৭ ফুট ১ ইঞ্চি) লম্বা। মিশিগানে এঁদের বাড়ি।

পুতুল-খেলা

সুন্দর পুতুলের ঘর, চোখ-বোজা চোখ-খোলা সোনালি চুলের পুতুল, তার ছোট-ছোট হাত-পা—ছেলেবেলায় এরকম একটা পুতুল-কেন্দ্রিক স্বপ্নের পৃথিবীতে সকলেই থাকতে ভালবাসে। বড় হয়ে গেলেও পুতুল জমানোর অভ্যাস অনেকে ছাড়তে পারেন না। কিন্তু, আমরা কি কল্পনাও করতে পারি পৃথিবীর সবচেয়ে দামি পুতুলটিকে পেতে হলে কত টাকা খরচ করা দরকার? পুতুলটির চেহারাই বা কেমন?

লণ্ডনের সথ্‌সবি নামক পুতুলের দোকান

পৃথিবীর সবচেয়ে দামি পুতুল

থেকে মাদাম দিনা ভিয়েরনি ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে ৯০২০০ পাউণ্ড খরচ করে একটিই পুতুল কিনলেন! মাদাম দিনা ভিয়েরনিকে প্রশ্ন করে জানা গেছে যে, তিনি একটা শিশুদের জাদুঘর তৈরি করতে চান ফ্রান্সে। ওই পুতুলটি তাঁর এত পছন্দ হয়েছে যে, বেশি দাম সত্ত্বেও তিনি জাদুঘরে রাখবার জন্য ওটিকে নির্বাচিত করেছেন এবং কিনেছেন। পুতুলটির কোনও যান্ত্রিক বিশেষত্ব নেই। কিন্তু নিখুঁতভাবে তৈরি। দেখতে এত সুন্দর যে, সকলেই পুতুলটিকে কিনতে আগ্রহী হবেন। দিনা ভিয়েরনি অবশ্য নিলামে দাম ঘোষণা করার পর কেউ সাহস করে পুতুলটির জন্য তাঁর চেয়ে বেশি অর্থব্যয় করতে চাননি।

শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপ

সবচেয়ে শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপ তৈরি করেছেন আই বি এম সংস্থা, সুইজারল্যান্ডের জুরিখ ল্যাবরেটরিতে। এই বিশেষ মডেলের মাইক্রোস্কোপটির চেহারা এত ছোট যে, হাতের মুঠোয় ভরে নেওয়া যায়। অথচ, এই মাইক্রোস্কোপেই, এমনকী, পদার্থের পারমাণবিক সজ্জাও চোখে দেখা যাবে। কোনও পদার্থকে এই মাইক্রোস্কোপ একশো মিলিয়ন গুণ বড় করে দেখাতে পারে। কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল এফেক্টের সাহায্যে নির্মিত এই মাইক্রোস্কোপ অতি ক্ষুদ্র বস্তুর পরিষ্কার ছবি ফুটিয়ে তোলে। ক্রিস্টাল সিলিকনের পারমাণবিক সজ্জার ছবি এই মাইক্রোস্কোপে দেখা যায়। উজ্জ্বল গোলাকার পিণ্ডগুলি ওই পদার্থের পরমাণু আর মধ্যবর্তী আবছা দাগগুলি ইলেকট্রন বণ্ড, যা পরমাণুগুলিকে একত্রে ধরে রাখছে।

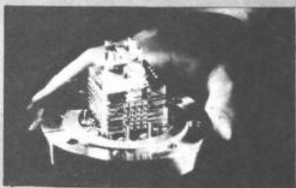

ক্ষমতায় সেরা খুদে মাইক্রোস্কোপ

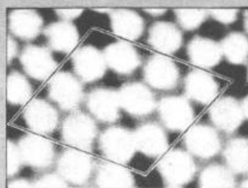

সিলিকনের পরমাণুর ছবি

টিটভ আর ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ার মুসা মানারভ। তাঁরা মহাকাশে কাটিয়েছেন ৩৬৫ দিন ২২ ঘণ্টা ৩৯ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড। এখনও পর্যন্ত যে ২১৪ জন মানুষ মহাকাশে পাড়ি জমিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে বয়স্কতম. আমেরিকার কার্ল জি হেনিজ। যিনি ১৯৮৫ সালে চ্যালেঞ্জারে চেপে মহাকাশে পাড়ি দেন। সে-সময়ে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। সবচেয়ে অল্পবয়সী নভোচারী ঘেরমান স্তেপানোভিচ টিটভ (সোভিয়েত রাশিয়া) ১৯৬১ সালে ভস্তক-২-তে চেপে উড়ে যান, যখন তাঁর বয়স ২৫ বছর ১০ মাস ২৯ দিন। সভ্যতার সঙ্গে-সঙ্গে মানুষ স্থাপত্য শিল্পে

টিটভ ও মানারভ : দীর্ঘতম সময় মহাকাশে

দেখিয়েছে স্মরণীয় কৃতিত্ব। ইট-কাঠ-পাথরে তৈরি করেছে অবিস্মরণীয় কীর্তি। যেমন, পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু অফিস বাড়ি সিয়ারস টাওয়ার। আমেরিকার শিকাগো শহরের এই বাড়িটির উচ্চতা ৪৭৫·১৮ মিটার (১৫৫৯ ফুট)। ১১০ তলা এই বাড়িটিতে জানলা রয়েছে ১৬০০০টি।
এ-প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা উচিত পৃথিবীর বৃহত্তম স্টেডিয়ামটির নাম।
চেকোস্লোভাকিয়ার প্রাগ শহরের স্ত্রাহোভ স্টেডিয়ামে ২৪০,০০০ দর্শক একসঙ্গে ৪০,০০০ জিমনাস্টের ক্রীড়াকুশলতা উপভোগ করতে পারেন। পৃথিবীর উচ্চতম ব্রিজটির কথাও উল্লেখযোগ্য। আমেরিকার কলোরাডোর কাছে আরকানসাস নদীর ওপর নির্মিত ব্রিজটি জলতল থেকে ৩২১ মিটার (১০৫৩ ফুট) উঁচু।
শুধু স্থাপত্য নয়, কারিগরিবিদ্যাতেও মানুষ এনেছে বিপ্লব। পৃথিবীর দ্রুততম ট্রেন টিজিভি (ট্রেন আ গ্রাঁদ ভিতেস্) চালু হয়েছে ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর। ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বরের আগেই এর নির্ধারিত গতিবেগ আরও বেড়েছে। এই ট্রেনের সর্বোচ্চ গতিবেগ ২৭০ কিমি/ঘণ্টা। আকাশপথে তেমনই কনকর্ডের নির্মাণ পালটে দিয়েছে মানুষের জীবনযাত্রা।
সাংস্কৃতিক জগতেও কি নেই অবাক-করা ঘটনা? সাহিত্য, নাটক, সিনেমা, গান, শিল্পকলা সমস্ত ক্ষেত্রেই আছে নানা ধরনের বিশ্বরেকর্ড। রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতি প্রচারমাধ্যমও যত জনপ্রিয় হচ্ছে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ভরে উঠছে অবসর, ততই নেপথ্যে ভাঙাগড়া চলছে বিশ্বরেকর্ডের।
ক্যাথলিন লিন্‌ডসে। বইয়ের জগতে এই ভদ্রমহিলার নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক বিস্ময়। দুটি ছদ্মনাম ও আটটি লেখক-নামে ইনি তাঁর সত্তর বছরের (১৯০৩ – ৭৩) জীবদ্দশায় বই লিখেছেন ৯০৪টি! সাউথ আফ্রিকার কেপ প্রভিন্সের এই লেখিকা শুধু উপন্যাসই লেখেন। ক্যাথলিন লিন্‌ডসের পাশাপাশি নাম করতে হয় এক ভারতীয় লেখকের। মহারাষ্ট্রের বাবুরাও আরনালকর (জন্ম ১৯০৭) ১৯৩৬ থেকে ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ছোট-ছোট রহস্য-কাহিনীর বই প্রকাশ করেছেন মোট ১০৯২টি। এইসব রহস্য গল্প ছাড়াও তিনি রম্যরচনার কয়েকটি বইও প্রকাশ করেছেন। ছোটদের বইয়ের জগতে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক বই লেখার

আজব কম্পিউটার

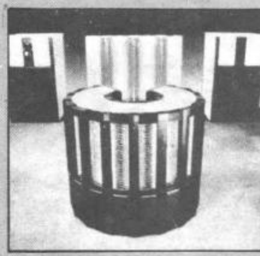

ক্রে-২ : দাম পৌনে দু' কোটি ডলার

বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং দ্রুততম কম্পিউটার লিকুইড কুল ক্রে-২'-এর নাম রাখা হয়েছে মার্কিন বিজ্ঞানী সিমুর আর ক্রে-র নামানুসারে। কম্পিউটারের শক্তির বিচার হয় এর স্মৃতিতে কতটা তথ্য ধরে এবং এটি কত দ্রুত কাজ করতে পারে তার ওপর। ক্রে-২-তে ৩ কোটি ২০ লক্ষ বাইট তথ্য জমা রাখা যায়। বর্ণ বা সংখ্যাকে কম্পিউটার শূন্য ও এক-এর মালার মাধ্যমে প্রকাশ করে। এই মালার দৈর্ঘ্য প্রকাশ করা হয় বিট নামে এককের মাধ্যমে। এক বাইট, আট বিটের সমান।

একনাগাড়ে ৪৩৮ দিন

বিশ্বের দীর্ঘতম দৌড়ের রেকর্ড আমেরিকার সারা কভিংটন ফালচার-এর দখলে। ১৯৬২ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ভদ্রমহিলার জন্ম। ক্যালিফোর্নিয়ার লাগুনা হিল থেকে তিনি দৌড় শুরু করেন ১৯৮৭-র ২১ জুলাই। ৪৩৮ দিন তিনি ক্রমাগত দৌড়তে থাকেন। গড়ে প্রতিদিন তিনি ৪০·৯ কিলোমিটার দৌড়েছেন এবং তাঁর দৌড় শেষ হয় ১৯৮৮ সালের ২ অক্টোবর, লস অ্যাঞ্জিলিসে। তিনি মোট ৩৫টি প্রদেশের মধ্য দিয়ে দৌড়েছেন। তাপমাত্রার তারতম্য ছিল বিস্ময়কর। নিউ হ্যাম্পশায়ারের কনকর্ড অঞ্চলের মধ্য দিয়ে তিনি যখন দৌড়ে গেছেন, তখন সেখানকার উষ্ণতা ছিল ৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং ক্যালিফোর্নিয়া বেকারে এসে দেখলেন — ৫১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এই দৌড়ের সময় সারার ব্যবহৃত জিনিসপত্রের তালিকা বলে দেয় এই মহিলার কী অসামান্য ক্ষমতা! তিনি ব্যবহার করেছেন ২৬ জোড়া দৌড়ের জুতো, ২০টি টি-শার্ট, ১৫টি শর্টস আর ৬টি সোয়েটস্যুট!

সারা এবং তাঁর ব্যবহৃত জিনিসপত্র

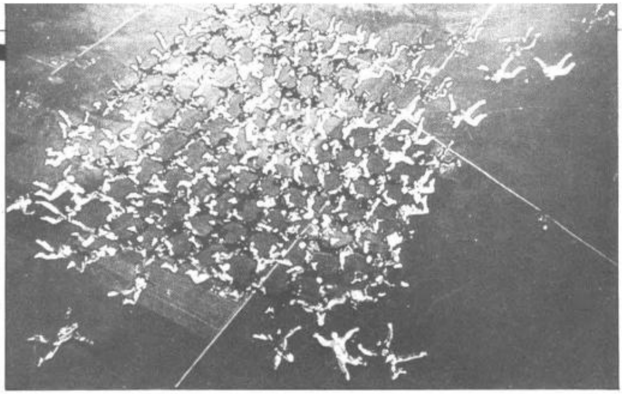

হীরক আকৃতির বৃহত্তম মনুষ্যজাল

কৃতিত্ব আমাদের অনেকের প্রিয় রোমাঞ্চ কাহিনী লেখিকা এনিড ব্লাইটনের। এঁর লেখা ৭০০টি বই আজও যথেষ্ট জনপ্রিয়।

শব্দ-জব্দ করতে কে না ভালবাসে! প্রথম শব্দ-জব্দ প্রকাশিত হয় সেই ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে, নিউ ইয়র্কে। সংবাদপত্রের নাম 'সেন্ট নিকোলাস'। সবচেয়ে তাড়াতাড়ি একটি সম্পূর্ণ শব্দ-জব্দ সমাধান করার বিশ্বরেকর্ড ব্রমলির রয় ডিন নামক ব্যক্তির। 'দ্য টাইমস' শব্দ-জব্দ তিনি সমাধান করেছেন বিবিসি টুডে রেডিও স্টুডিওতে, ১৯৭০ সালের ১৯ ডিসেম্বর। তাঁর সময় লেগেছিল মাত্র ৩ মিনিট ৪৫ সেকেন্ড।

এ কেমন কাকতাড়ুয়া

বিশ্বরেকর্ড স্পর্শ করতে মানুষ নানারকম বিস্ময়কর কাজে যুক্ত হয়। এইসব ক্রিয়াকলাপে পরিচয় মেলে একাধারে কল্পনাশক্তি এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতার। নির্দিষ্ট বাঁধা গণ্ডির মধ্যেই নয়, কত নতুন ক্ষেত্রে, কত নতুন বিষয়ে পুরনো রেকর্ড ভেঙে নতুন রেকর্ড গড়ে তুলতে সচেষ্ট হচ্ছেন ব্যক্তিমানুষ বা সঙ্ঘবদ্ধ কয়েকজন, তার প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে দেশে-বিদেশে। বৃহত্তম কাকতাড়ুয়া তৈরি করার ঘটনাটাও কি তেমনই এক অবাক-করা কাজ নয়?

গ্রামেগঞ্জে খেতের মধ্যে নানা চেহারার কাকতাড়ুয়া চোখে পড়ে। কিন্তু বৃহত্তম কাকতাড়ুয়ার আকারের পাশে সেগুলো তো নেহাত ছোট। বৃহত্তম কাকতাড়ুয়াটির উচ্চতা ৯০ ফুট ১ ইঞ্চি, ছড়ানো দু' হাতের মধ্যে দূরত্ব ৬৫ ফুট! এটি দেখতে পাওয়া যাবে নর্থ ইয়র্কশায়ারের মাঠে। তৈরি করেছেন ক্যাসল হাওয়ার্ডের ওয়ার্ড বিল্ডিং সিস্টেমস লিমিটেড কম্পানির কুড়িজনের একটি দল। কাকতাড়ুয়াটির পরিকল্পনা করে দিয়েছেন অ্যালান পটেজ। এই সুবিশাল কাকতাড়ুয়াটিকে কাকেরা আদৌ খুব ভয় পাচ্ছে কি না, সে-কথা অবশ্য জানা যায়নি।

৯০ ফুট ১ ইঞ্চি লম্বা সেই দীর্ঘতম কাকতাড়ুয়া

গাড়ির কথা

আধুনিক জীবনে যে গাড়ি প্রায় অপরিহার্য সেই অটোমোবাইল বা পেট্রল এঞ্জিনচালিত গাড়ির ইতিহাস কিন্তু খুব বেশিদিনের নয়। প্রথম পেট্রলচালিত গাড়ি চালু হয়েছিল ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে। সেই 'বেন্‌জ মোটর ওয়াগেন' নামের গাড়ির চেহারা কিন্তু এখনকার গাড়ির চেয়ে অনেক আলাদা। তারপর মানুষ কারিগরি বিদ্যার তুঙ্গে উঠেছে ক্রমশ, আর তৈরি হয়েছে নিত্য নতুন স্থলযান। তাদের গতিও যেমন দিনে-দিনে বৃদ্ধি পেয়েছে, বৃদ্ধি পেয়েছে কম জ্বালানি নিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার ক্ষমতা। আধুনিককালে আবার নির্মিত হয়েছে ব্যাটারিচালিত গাড়িও।

বর্তমান পৃথিবীর দ্রুততম গাড়ির নাম থ্রাস্ট-২। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে এর গতিবেগ মাপা হয়েছে ১০১৯·৪ কিমি/ ঘণ্টা। এটি জেট এঞ্জিনওলা গাড়ির মধ্যে দ্রুততম। অন্যদিকে কম জ্বালানি নিয়ে দীর্ঘতম পথ অতিক্রম করার রেকর্ড টয়োটা ল্যাণ্ড ক্রুইসার ডিজেল গাড়ির। ৩১ ঘণ্টা ৮ মিনিট অবিচ্ছিন্ন ভ্রমণ করে এই গাড়ি ১৩৫·১ লিটার তেলে সিডনি থেকে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত ২০৯৪·৯ কিমি পথ অতিক্রম করেছে।

ডিজেল গাড়ি ক্রুইজার

দ্রুততম গাড়ি

ধরন	কিমি/ঘণ্টা	গাড়ির নাম	চালক	স্থান	তারিখ
জেট এঞ্জিনবিশিষ্ট	১০১৯·৪	থ্রাস্ট-২	রিচার্ড নোবল (ইংল্যান্ড)	নেভাদা (আমেরিকা)	৪ অক্টোবর ১৯৮৩
রকেট এঞ্জিনবিশিষ্ট	১০০১·৪৭৩	ব্লু ফ্লেম	গ্যারি গ্যাবেলিক (আমেরিকা)	উটা (আমেরিকা)	২৩ অক্টোবর ১৯৭০
হুইল চালিত টারবাইন	৬৯০·৯০৯	ব্লু বার্ড	ডোনাল্ড ক্যাম্পবেল (ইংল্যান্ড)	লেক আয়ার (অস্ট্রেলিয়া)	১৭ জুলাই ১৯৬৪
বহু পিস্টনবিশিষ্ট	৬৭৩·৫১৬	গোল্ডেন রড	রবার্ট সামার্স (আমেরিকা)	উটা (আমেরিকা)	১২ নভেম্বর ১৯৬৫
এক পিস্টনবিশিষ্ট	৫৭৫·১৪৯	হেরডা-ন্যাপ-মিলোদোন	বব হেরডা (আমেরিকা)	উটা (আমেরিকা)	২ নভেম্বর ১৯৬৭

সঙ্গীতজগতেও আছে যেমন বৈচিত্র্য তেমনই নানারকমের রেকর্ড। ধ্রুপদী পাশ্চাত্য সঙ্গীতানুষ্ঠানে সর্বোচ্চ জনসমাগম হয়েছে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের ৫ জুলাই। এইদিন নিউ ইয়র্কের গ্রেটলন অব সেন্ট্রাল পার্কে নিউ ইয়র্ক ফিলহারমনিক অর্কেস্ট্রা শুনতে

সাতটি গল্‌ফ বল পরপর সাজিয়েছেন ল্যাং মার্টিন

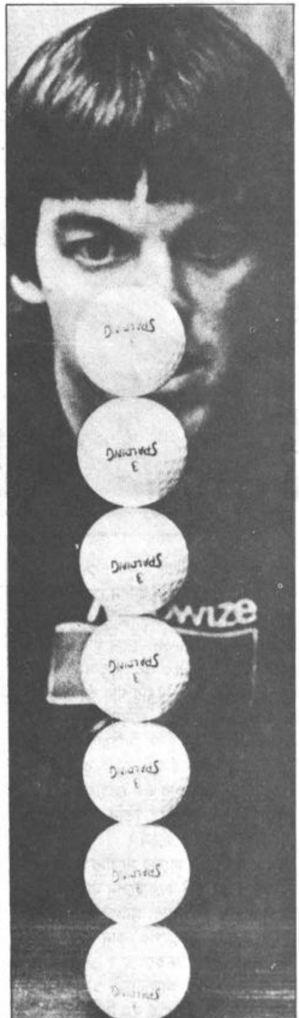

মহিলা-ক্রিকেটে বিশ্বকাপজয়ী

ক্রিকেটের খবর, তার বিভিন্ন রেকর্ডবুক যাঁদের মুখস্থ তাঁরাও হয়তো মহিলা-ক্রিকেটের অনেক তথ্য-সম্পর্কে ততটা ওয়াকিবহাল নন। এবারের মহিলা-ক্রিকেটের বিশ্বকাপ আয়োজিত হল ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে। বিশ্বকাপ জিতল অস্ট্রেলিয়া। ফাইনালে ইংল্যাণ্ডকে হারিয়ে দিল ৮ উইকেটে।

অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং কৃতিত্বই অবশ্য এ-জয়ের প্রধান কারণ। তৃতীয় উইকেটে জুটিতে ডেনিস অ্যানেট এবং লিন্ডসে রিলার ১১৫ রান যোগ করে অস্ট্রেলিয়ার জয়কে ত্বরান্বিত করেন। ডেনিস অ্যানেট শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকেন ব্যক্তিগত ৪৬ রানে আর লিণ্ডসে রিলার অপরাজিত ৫৯ রানে দর্শকদের মুগ্ধ করেন দৃষ্টিনন্দন স্ট্রোকের পর স্ট্রোকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই ডেনিস অ্যানেটের দখলে রয়েছে টেস্ট ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রান করার রেকর্ড। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩-২৪ অগাস্ট, ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ইনি নটিংহামশায়ারে ১৯৩ রান করেন। এই রান করতে তাঁর লেগেছিল ৩৮১ মিনিট। সেদিনও তাঁকে উইকেটে সমানতালে সহায়তা করেছিলেন লিণ্ডসে রিলার। তিনি করেছিলেন অপরাজিত ১১০ রান। দু'জনে মিলে তৃতীয় উইকেটে ৩০৯ রান যোগ করেন দলীয় রান-সংখ্যায়। এটিও একটি বিশ্বরেকর্ড। মহিলা টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রানের জুটি এই ডেনিস-রিলার জুটিতে গড়া ৩০৯ রান। বিশ্বকাপ ফাইনালে ডেনিস-রিলার জুটির তৃতীয় উইকেটে অসাধারণ ব্যাটিং প্রমাণ করে দিল ইচ্ছে এবং মনোযোগ থাকলে একটির-পর-একটি বিশ্বরেকর্ড গড়া যায়, স্মরণীয় হয়ে থাকা যায় ইতিহাসে।

১৯৮৮ সালের মহিলা বিশ্বকাপ ক্রিকেট ফাইনালের উত্তেজনাময় মুহূর্ত

এসেছিলেন আট লক্ষ মানুষ। সেদিন অর্কেস্ট্রা পরিচালনা করেছিলেন জুবিন মেহতা।

একক সঙ্গীতানুষ্ঠানে সর্বোচ্চ জনসমাগম ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনিরোর মারাকানা স্টেডিয়ামে। ১৭৫০০০ মানুষ সমবেত হয়েছিলেন ফ্রাঙ্ক সিনাত্রার গান শুনতে, ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি।

সিনেমা, থিয়েটার, টিভি সিরিয়ালে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক চরিত্রে অভিনয় করে রেকর্ড করেছেন আমেরিকার জন লেইটন। ১৯৫১ থেকে ১৯৮৯-এর মধ্যে তিনি মোট ৩৩৮৫টি চরিত্রে অভিনয় করেছেন!

আমরা জানি, সর্বকালের সর্বোচ্চ রেকর্ড বিক্রির নজির সৃষ্টি করেছিলেন মাইকেল জ্যাকসন, তাঁর 'থ্রিলার' অ্যালবামটি প্রকাশের পর। কিন্তু, কোন গ্রুপের কোন অ্যালবাম সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে? ফ্লিটউড ম্যাক দলের 'রিউমারস' অ্যালবামটি ১৯৮৭-র মে মাস পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে ২০ মিলিয়ন। এটিও বিশ্বরেকর্ড।

'দ্য কিওর ফর ইনসোমনিয়া' পৃথিবীর দীর্ঘতম সিনেমা! ৮৫ ঘণ্টার এই ছবিটি ১৯৮৭ সালে তৈরি করেছেন পরিচালক হেনরি টিমিস। শিকাগোয় ছবিটি প্রথম দেখানো হয়।

টেলিভিশন-সংক্রান্ত অনেক বিশ্বরেকর্ড হতবাক করে দেবার মতো। সেগুলির মধ্যে না গিয়ে শুধু দুটি তথ্য পরিবেশন করি। সবচেয়ে বড় টেলিভিশন বানিয়েছেন সোনি সংস্থা। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে একটি প্রদর্শনীতে তাঁরা এই মডেলটিকে জনসমক্ষে উপস্থিত করেন। এই টিভি পরদাটির মাপ ৮০ ফুট × ১৫০ ফুট! সিকো টিভি রিস্টওয়াচ-এর কথা মনে রাখলেও সবচেয়ে ছোট রঙিন টেলিভিশন বানাবার কৃতিত্ব জাপানি এপসন কম্পানির। তাঁদের এই টেলিভিশনের পরিমাপ ৭·৬×১৭·১×২·৮ সেমি, ওজন ৪৫৩ গ্রাম মাত্র! ব্যাটারিচালিত এই খুদে টেলিভিশনটিতে নানা অনুষ্ঠান দেখা যাবে লিকুইড ক্রিস্টাল ডিস্‌প্লের মাধ্যমে।

উদ্ভট কাজকর্মেও মানুষের জুড়ি মেলা ভার। উড়ন্ত মানুষের তৈরি সবচেয়ে বড় আকাশজাল তৈরি হয় ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকায়। এই দিন ১৪৪ জন প্যারাশুটিস্ট হীরক আকৃতির এক অবয়ব আকাশে নির্মাণ করেন শূন্যে পরস্পরের হাত ধরে। বৃহত্তম জ্যামিতি বাক্সের সরঞ্জাম তৈরি করা হয়েছে সৌদি আরবে। যার কম্পাসের উচ্চতা ৩৭·২৫ মিটার বা ১২২ ফুট। ফ্রান্সের মিচেল লোলিটো ১৯৫৯ সাল থেকে ধাতু আর কাচ খেয়ে দিন কাটাচ্ছেন। এমনকী ১৯৬৬ সালের মধ্যে তিনি দশটা বাইসাইকেল

দুধের বোতল মাথায় নিয়ে

নিউ ইয়র্কের অ্যাসরিটা ফারমান মাথায় একটি ভর্তি দুধের বোতল নিয়ে হেঁটেছেন ৫২·৯ কিমি। এই দীর্ঘ পথ-পরিক্রমাকালে একবারও মাথা থেকে পড়ে যায়নি দুধের বোতলটি, একবারও ধরতে হয়নি বোতলটিকে হাত দিয়ে। অ্যাসরিটা ফারমান থাকেন আমেরিকায়, কিন্তু এই বিস্ময়কর ক্ষমতাটি দেখিয়েছেন থাইল্যাণ্ডের ফুকেট শহরে। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জানুয়ারি তিনি ওইরকম অদ্ভুতভাবে হেঁটেছেন।

দুধের বোতল মাথায় নিয়ে হেঁটেছেন ফারমান

সেরা জলযান

আকাশ, মাটি, জল—এই তিনটি ক্ষেত্রেই মানুষ তার জয়যাত্রা অব্যাহত রেখেছে। জলযান নির্মাণের দক্ষতা বিস্ময়কর। পালতোলা জাহাজ থেকে আধুনিকতম কারিগরির বিরাট-বিরাট জলযান মানুষই তৈরি করেছে জলপথে বাধাহীনভাবে ভ্রমণ করার জন্য।

এই মুহূর্তে পৃথিবীর বৃহত্তম যাত্রিবাহী জাহাজের নাম সভরেন অব দ্য সি-স। ফ্রান্সের সেন্ট নাজাইরের স্যান্টিয়ার দে ল' অতলান্তিক শিপইয়ার্ডে এটি তৈরি। জানুয়ারি ১৯৮৮ থেকে এই জাহাজটি যাত্রী নিয়ে সমুদ্রে পাড়ি জমাতে শুরু করেছে। জাহাজের কর্মী, অফিসার, হোটেল কর্মচারী, এঞ্জিনিয়ার ও যাত্রী মিলিয়ে এই জাহাজে ভ্রমণ করতে পারেন মোট ৭৫০ জন! ৭৩১৯২ টনের এই দৈত্যাকৃতি জাহাজের গড় গতিবেগ ১৬-২১-নট।

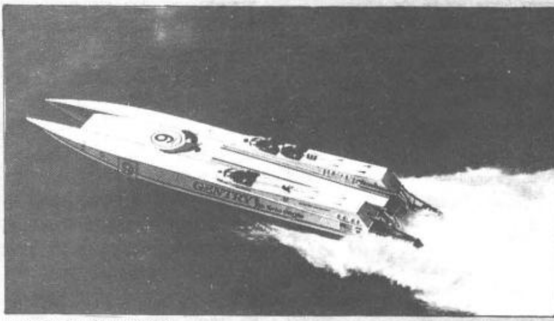

দ্রুততম জলযান 'টারবো ঈগল'

'সভরেন অব দ্য সিজ' : বৃহত্তম জলযান

শুধু যাত্রী বহনের ক্ষমতায় বৃহত্তম জলযানই নয়, দ্রুততম জলযানও মানুষ তৈরি করেছে। শক্তিচালিত পাওয়ার বোট 'টারবো ঈগল' ছিমছাম, সুদৃশ্য একটি জলযান। দৈর্ঘ্যও খুব বেশি নয়, মাত্র ৪৯ ফুট। এর গতিবেগ ঘণ্টায় ২৪৮·৫৩৭ কিলোমিটার। আমেরিকার টম জেনট্রি এই গতিবেগে টারবো ঈগল-কে চালিয়ে প্রমাণ করেছেন এটিই জলযানের মধ্যে পৃথিবীতে দ্রুততম। সমুদ্রের উথালপাথাল ঢেউ পর্যন্ত এর গতি কিছুমাত্র কমাতে পারেনি।

সবচেয়ে ছোট থিয়েটার

সাধারণত থিয়েটার হল বা নাট্য প্রেক্ষাগৃহগুলি নির্মাণ করা হয় সবচেয়ে বেশিসংখ্যক দর্শক যাতে আসন গ্রহণ করতে পারেন, দেখতে পারেন নাটক বা অনুষ্ঠান, সেই কথা মাথায় রেখেই। কিন্তু, পশ্চিম জার্মানির হামবুর্গে পিকোলো থিয়েটার অভিনব এক প্রেক্ষাগৃহ। এটি পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম থিয়েটার হল। জুলিয়ুসত্রাসের পিকোলো থিয়েটার তৈরি করা হয়েছিল ১৯৭০ সালে। এই থিয়েটারে আসনসংখ্যা মাত্র তিরিশ।

পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম থিয়েটারে অনুষ্ঠান দেখার অভিজ্ঞতা সকলের জীবনেই স্মরণীয় ঘটনা। তাই পিকোলো থিয়েটারে অভিনয় দেখার জন্য দর্শকদের ভিড় সবসময় লেগেই থাকে।

খেয়েছেন।

খেলাধুলোর জগতেও রয়েছে হাজার রকমের বিস্ময়। কয়েকটি তত পরিচিত নয়, এমন রেকর্ড সৃষ্টিকারীর কথা বলি। পৃথিবীর দ্রুততম মহিলা আইস স্কেটার ইভন জেনিপ (নেদারল্যান্ডস) বর্তমানে ৩০০০, ৫০০০ এবং ১০,০০০ মিটার দৌড়ে বিশ্বরেকর্ড করেছেন। ১৯৮৮-র ওলিম্পিকে এই মহিলা ১৫০০ মিটারে জিতে এনেছেন তৃতীয় সোনা! অন্যদিকে আইস সারফারে দ্রুততম গতি দেখিয়েছেন নেদারল্যান্ডেরই জুপ নেদারপেল্ট। তাঁর গতি ১৯৮৭ সালে দেখা গেছে ঘণ্টায় ১০২ কিমি। ফুটবলার অ্যালান অ্যাবুটো নিয়ানজঙ (কেনিয়া) ১৯৮৮ সালের ১৬ জানুয়ারি মোট ১৬ ঘণ্টা ২৭ মিনিট, একবারও মাটিতে বল না ঠেকিয়ে মাথায়, পায়ে এবং পায়ের আঙুলে নাচিয়ে গেছেন! সুইডেনের টমাস লুঁদমান ১৯৮৯ সালের ২০ মে সুইডেনে শুধু হেড করে বল নাচিয়েছেন ৫ ঘণ্টা ১২ মিনিট। এ-দুটোই বিশ্বরেকর্ড হিসেবে স্বীকৃত।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, গিনেস বুক অব রেকর্ডস এক অফুরন্ত বিস্ময়ের ভাণ্ডার। প্রতি পৃষ্ঠায় সেরা চমক আর শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলির সর্বাধুনিক সংবাদ। বইটি পড়তে-পড়তে মনে হয়, এই মুহূর্তেই পৃথিবীর কোনও প্রান্তে ঘটে যাচ্ছে একটির পর একটি বিস্মিত হওয়ার মতো ঘটনা, সৃষ্টি হচ্ছে অবিশ্বাস্য সব রেকর্ড।

বেসিকের প্রথম ধাপ

কম্পিউটারকে দিয়ে নানা কাজ করাবার আকর্ষক ও জনপ্রিয় ভাষা বেসিক। এই ভাষা শিখতে গেলে প্রথমেই যা জানা দরকার সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন **অসীমরতন ঘোষ**

লোগো ভাষায় নানারকম নির্দেশ দিয়ে কীভাবে নানারকম ছবি আঁকা যায় তা আমরা আগেই দেখেছি। এবারে আমরা আলোচনা করব কম্পিউটার প্রোগ্রাম শেখার জন্য দারুণ সহজ আর জনপ্রিয় ভাষা বেসিক নিয়ে। এই ভাষা ব্যবহার করে অনেক জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ কাজও করা যায়। এই ভাষা শেখার জন্য তোমাকে বেশ কিছু নির্দেশ আয়ত্ত করতে হবে। তাদের কীভাবে কাজে লাগিয়ে তুমি প্রোগ্রাম লিখবে তা সম্পূর্ণ তোমার ব্যাপার। ইট বালি সিমেন্ট দিয়েই অধিকাংশ বাড়ি তৈরি হয়। তবু পরিকল্পনার তারতম্যের জন্য এক-একটি এক-একরকম রূপ নেয়। কম্পিউটার প্রোগ্রামের ব্যাপারটাও একইরকম। কীরকম দক্ষতার সঙ্গে বেসিক ভাষার মূল এককগুলো জুড়ে নির্ভুল ও সুন্দর প্রোগ্রাম লিখতে পারছ—তাই দেখার বিষয়। বেসিকের প্রত্যেকটি নির্দেশই এক-একটি নির্দিষ্ট কাজ করে। একটি একটি করে নির্দেশ কম্পিউটারকে পালন করতে বললেও সে তা করবে। কিন্তু তাতে বেশ কিছু অসুবিধে আছে। যেমন মনে করো সাইকেল সারাবার দোকানে তোমার সাইকেলের পাঁচটা জিনিস সারাবার জন্য নিয়ে গেছ। তুমি মিস্ত্রিকে এক-একটা করে কাজ শেষ হওয়ার পর পরের কাজটা করতে বলতে পারো। তাতে মুশকিল হল পুরো সময়টা তোমাকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। কিন্তু পর পর যে কাজগুলি করতে হবে তার পুরো তালিকা দিয়ে দিলে তিনি পর পর কাজগুলো করে দিতে পারেন। কম্পিউটার প্রোগ্রামও কম্পিউটারের কাজের তালিকা ছাড়া আর কিছুই নয়। হাজার-হাজার সহজ ও কঠিন ব্যাপারে কম্পিউটার কাজে লাগলেও নিজের বুদ্ধি তার একেবারেই নেই। নিজের থেকে কোনও সমস্যার সমাধান করা তার পক্ষে অসম্ভব। ঠিক কী কী ভাবে কাজ করলে সমস্যাটি সমাধান করা যাবে তা ভেবে বের করতে হয় মানুষকেই। সমস্যাকে ছোট-ছোট ভাবে টুকরো করে ঠিকমতো সাজানো ও তাকে কম্পিউটারের ভাষায় লিখে ফেলাই হল প্রোগ্রাম লেখা। এবার দেখা যাক,

বিদেশের অনেক কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের কম্পিউটার কিনতে বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হয়

কমোডর কম্পিউটারের আঁকা দারুণ ছবি

তৈরি প্রোগ্রাম—প্রোগ্রাম লেখার ঝামেলা এড়াতে একে দরকার

কীভাবে বেসিক ভাষায় প্রোগ্রাম লেখা যায়। প্রথমেই দেখা যাক কোন কোন চিহ্ন দিয়ে বেসিক প্রোগ্রাম লেখা হয়। ইংরেজি শূন্য বর্ণমালার A থেকে Z পর্যন্ত সমস্ত অক্ষর, ০ থেকে ৯ পর্যন্ত সমস্ত সংখ্যা এবং $, #, ",—এই জাতীয় বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করা চলবে। কোনও গাণিতিক সমীকরণ লিখতে গেলে এইসব চিহ্ন ব্যবহার করা যাবে : + (যোগ), - (বিয়োগ), * (গুণ), / (ভাগ), ↑ বা ∧ (ঘাত চিহ্ন), > (বৃহত্তর), < (ক্ষুদ্রতর), = (সমান চিহ্ন), ≮ (ছোট নয়), ≥ (বড় বা সমান)।

সংখ্যা ও শব্দ :

বেসিকের মূল চরিত্রগুলোকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করা যায় শব্দ (যেমন CIRCLE), সংখ্যা (যেমন 134) বা সংখ্যা-শব্দ (যেমন, L14B বা 5 Park Street) বেসিকে রাশি আবার নানারকম। কোনওটার মান সবসময়েই এক থাকে। এরা হল ধ্রুবরাশি।

যেসব রাশি নানা সময়ে নানারকম মান নেয় তাদের চলরাশি বলে। যেমন, ক্রিকেটে যে-কোনও দলের খেলোয়াড়-সংখ্যা সবসময়ই এক থাকে। তাই এটি ধ্রুবরাশি। কিন্তু বিভিন্ন টেস্টে আজহারউদ্দিনের রানসংখ্যা নানারকম। এটি একটি চলরাশি। মনে করো,আমরা কম্পিউটারকে সঙ্গে নিয়ে কোনও ম্যাচে তিন খেলোয়াড়ের রানসংখ্যা যোগ করতে চাই। লক্ষ্মীর ভাঁড়ে যেভাবে পয়সা জমানো যায় কম্পিউটারও তেমনই প্রত্যেক রাশির জন্য তার স্মৃতিতে কিছুটা জায়গা ছেড়ে দেয়। যদি বলো AZHAR=105 তা হলে আজহার নামে এক বাক্সে ১০৫ সংখ্যাটি ইলেকট্রনিকভাবে জমা আছে—এমনভাবে ব্যাপারটি দেখা যায়। এমনভাবেই যদি বলো KAPIL=35 ও SIDHU=70 এবং তারপরে বলো AVERAGE = (AZHAR+KAPIL+SIDHU)/3 তা হলেই গড়টি পাওয়া যাবে।

তবে মনে রেখো,কোনও রাশির নামের মাঝে যেন কোনও ফাঁক না থাকে। যেমন : GAMEPOINT লিখতে গিয়ে GAME POINT লিখলে চলবে না। কোনও নাম-এর শুরুতে যেন সংখ্যা না থাকে। (8th match লেখা চলবে না)। নামের মধ্যে বিশেষ কোনও চিহ্ন রাখা যাবে না। কোনও রাশির নাম করার সঙ্গে-সঙ্গে কম্পিউটার তার স্মৃতিতে কিছুটা জায়গা ছেড়ে দেয় তার মান রাখার জন্য। যদি বলা হয় KAPIL=28 তা হলে স্মৃতির ওই

ইলেকট্রনিক অফিস

চিঠি, মেমো-ফাইল-এর স্তূপে ভরা অফিসবাড়ির চেহারা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। কাগজপত্রের গুরুত্ব ক্রমেই কমছে। তার জায়গা নিচ্ছে ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা। ফ্যাক্স, পি· বি· এক্স· নেটওয়ার্ক, ইলেকট্রনিক ডেস্ক—আমূল পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে অফিসগুলোতে। বড়-বড় ঘর ভর্তি নথিপত্র এখন ছোটখাটো ইলেকট্রনিক ডেস্কে ধরে যায়। আর কিছুদিন পরে কোনও অফিসেই হয়তো একটুকরো কাগজও দেখতে পাওয়া যাবে না। আদৌ অফিসবাড়ি বলেই কিছু হয়তো আর থাকবে না। কর্মীরা কাজ করবেন বাড়িতে বসে। গ্রাহকরাও তাঁদের কাজ সারবেন নিজের-নিজের কম্পিউটার মারফত।

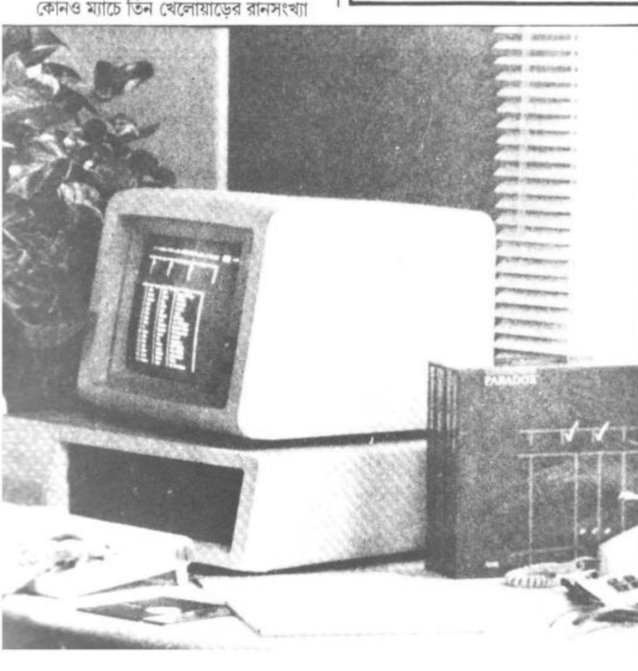

ডস নয়, ইউনিক্স ব্যবহার করে এই পি· সি· টি

অংশে 28 সংখ্যাটি জমা থাকবে । এবার KAPIL=KAPIL +52 লিখলে KAPIL নামে স্মৃতিকোষে যা জমা আছে (মানে 28) তার সঙ্গে 52 যোগ করে যোগফল জমা রাখা হবে ওখানে । অর্থাৎ 28-এর বদলে এখন 80 জমা থাকবে সেখানে ।

যে-কোনও সংখ্যাই দু'রকম হতে পারে—তাতে দশমিক থাকতে পারে, বা নাও পারে । কোনও ক্রিকেটারের রানসংখ্যা বা উইকেটের সংখ্যা লিখতে দশমিকের কোনও দরকার হয় না । এরা পূর্ণসংখ্যা । রানের গড় বা উইকেট পিছু রান দেওয়ার হার প্রকাশে সাধারণত দশমিক দরকার হয় । এদের বাস্তব সংখ্যা বলে। বাস্তব সংখ্যা বেশি জায়গা দখল করে থাকে । তাই পূর্ণ সংখ্যাকে পূর্ণ সংখ্যা হিসেবেই ব্যবহার করা উচিত । তবে শুধু সংখ্যাই নয়,কোনও রাশির নামের পাশে $ চিহ্নটি লিখে দিলে সেটি শুধু অঙ্ক নয় শব্দকেও মান হিসেবে গ্রহণ করতে পারে । যেমন NAME$="GOOD"

ফরমুলা

যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ—এই সমস্ত চিহ্ন ব্যবহার করে ফরমুলা তৈরি করা যেতে পারে । যেমন,

CIRCLE=3.14 × RADIUS ↑2

এখন প্রশ্ন হল কোন কাজটা আগে হবে, কোনটাই বা পরে । কম্পিউটার প্রথমেই ↑ এর কাজ,এর পরে গুণ ও ভাগের কাজ, তারও পরে যোগ ও বিয়োগের কাজ করবে । সে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে কাজ করতে-করতে যাবে । তোমার আর কম্পিউটারের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে বন্ধনী ব্যবহার করা দরকার ।

যদি লেখো X=A/B/C তা হলে তার তো দু'রকম অর্থ হতে পারে X=A/BC বা X=AC/B প্রথমটি বোঝাতে লেখো X=(A/B)/C দ্বিতীয়টির জন্য X=A/(B/C)

বেসিক ভাষার কয়েকটি প্রাথমিক ধারণার সঙ্গে আমরা পরিচিত হলাম । এর পরে

কীভাবে কম্পিউটার চালাবে: পার্সোনাল কম্পিউটার

যদি পার্সোনাল কম্পিউটারটি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে রাখা থাকে তা হলে ঘরটিকে বৈদ্যুতিকভাবে সংযুক্ত করে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে । তারপরে কম্পিউটারের ধুলো এড়ানোর ঢাকনা সরাতে হবে ।

কম্পিউটারের সি পি ইউ-এর সুইচ টিপতে হবে । তারপর কম্পিউটার মনিটরের সুইচ টেপো । কম্পিউটারের পরদার ঔজ্জ্বল্য ঠিক করতে হবে তার নীচের সুইচ টিপে । মনিটরের নীচের বাক্সের আকারের সি পি ইউ-এর সামনের দিকে একটি বা দুটি ফাঁক রাখা আছে । এদের বলে ডিস্ক-ড্রাইভ । এর মধ্যে A নামের ড্রাইভে MS DOS নামে সফটওয়্যারটি ঢুকিয়ে দাও । এবার ড্রাইভের দরজা বন্ধ করে দাও । কম্পিউটার কিছুক্ষণ ধরে নিজের র‍্যাম বা র‍্যান্ডম অ্যাকসেস মেমরি পরীক্ষা করবে । A ড্রাইভের ওপরের লাল আলো জ্বলে উঠবে । সেখানে রাখা MS DOS-কে কপি করে নেবে কম্পিউটার । সে এবার তোমার কাছ থেকে তারিখ ও সময় জানতে চাইবে । ১৩-৬-৯০'কে লিখতে হবে ০৬-১৩-৯০ এই আকারে । ১০টা বেজে ১৫ মিনিট ৩০ সেকেন্ডকে লিখতে হবে ১০ : ১৫ : ৩০— এই আকারে । তারিখ ও সময় লেখার পরে দু'বারই RETURN সুইচটি টিপতে হবে । এবার পর্দার বাঁ দিকে ফুটে উঠবে A > চিহ্নটি ।

তোমার প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য ও

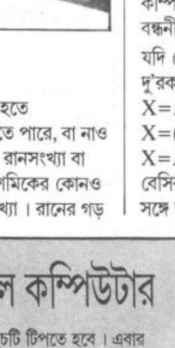

ফ্লপি ডিস্ক । কিছুটা কেটে ভেতরটা দেখান হয়েছে

প্রোগ্রাম তোমার ফ্লপি ডিস্কে জমিয়ে রাখতে হয় । কোনও একটা ফ্লপি ডিস্কে কী কী প্রোগ্রাম রাখা আছে এবং সেখানে আর কতটা জায়গা খালি আছে তা জানতে চালু ড্রাইভে ফ্লপিটি ঢুকিয়ে লিখতে হবে DIR<R> পরদায় ফুটে উঠবে সমস্ত প্রোগ্রামের নাম ।

কোনও প্রোগ্রামকে কপি করতে চাইলে লিখতে হবে

A>CopyY ANANDA. BAS B : <R>এতে আনন্দ, বাস নামের প্রোগ্রামটি A ড্রাইভের ফ্লপি থেকে B ড্রাইভের ফ্লপিতে কপি হয়ে যাবে কোনও প্রোগ্রামের নাম বদল করতে চাইলে লেখো :

RENAME X.Y. P.Q <R> । তা হলে X.Y নামের প্রোগ্রামটি P.Q নাম নেবে ।

কোনও ফাইল মুছতে চাইলে লেখো :

ERASE P.Q > <R>

একটা ফ্লপির সমস্ত প্রোগ্রাম ও

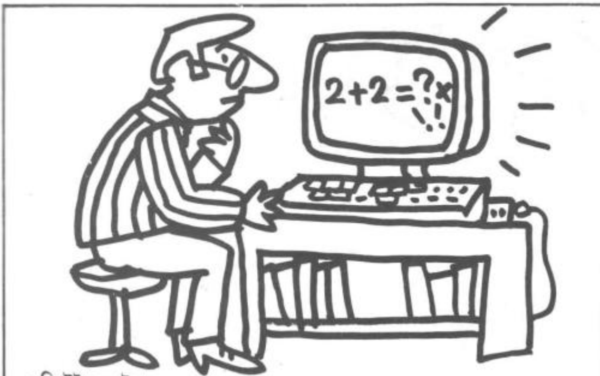

কম্পিউটার ভাইরাস

কম্পিউটাররা এখন ভয়ে-ভয়ে দিন কাটাচ্ছে। চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভাইরাস। আক্রান্ত ফ্লপি ডিস্ক সুস্থ কম্পিউটারে ঢোকানো মাত্র সেটির হার্ড ডিস্ক আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। এদের কোনও-কোনওটা কম্পিউটারকে অচল করে দিচ্ছে কোনওটা আবার মুছে দিচ্ছে প্রয়োজনীয় তথ্য। আমাদের দেশে একে-একে সি ব্রেন, জেরুজালেম, মারিজুয়ানা, বার্থডে —এরকম অজস্র কম্পিউটার-ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে। সত্যিকারের ভাইরাসের সঙ্গে এদের কোনও সম্পর্কই নেই। মিলটা হল দারুণ দ্রুততায় এরা নিজেদের মতো অজস্র ভাইরাস তৈরি করে ছড়িয়ে দেয় অন্যান্য ডিস্কে। কিছু বুদ্ধিমান দুষ্টু লোক এগুলো তৈরি করেছে। সারা দেশে বেআইনি ফ্লপি দারুণভাবে ব্যবহৃত হয় বলেই এরা এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পেরেছে। বিজ্ঞানীরা এদের তাড়াবার জন্য কিছু ভ্যাকসিনও আবিষ্কার করে ফেলেছেন।

আমরা আলোচনা করব এইসব বিষয়ে : (১) বেসিক বিবৃতি, (২) শর্ত সাপেক্ষ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ, (৩) বিন্যাস, (৪) আবর্ত, (৫) অপেক্ষক ও সাবরুটিন, (৬) ফাইল, (৭) রং ও শব্দ দিয়ে তৈরি গ্রাফিক্স ও অ্যানিমেশন।

বিবৃতি : বেসিকের নানারকম বিবৃতি ও নির্দেশগুলো দেখে নেওয়া যাক। আমরা অঙ্ক কষতে গিয়ে অনেক সময় প্রথমেই লিখি, ধরি লাভ=X তাই না ? বেসিকেও তেমনইভাবে কোনও চলরাশিতে কোনও নির্দিষ্ট মান বা সূত্র দিতে হলে LET কথাটা দিয়ে শুরু করতে হয়। তবে সমস্ত লাইনের শুরুতে তার ক্রম লেখা উচিত। যেমন,

10 LET X=10 বা
20 LET X=Y+Z

মনে করো, আমরা এমন একটি প্রোগ্রাম লিখতে চাই যা দিয়ে একজন খেলোয়াড়ের একটা সিরিজের সর্বোচ্চ রান, রান করার হার, কতবার তিনি শতরান করেছেন তা বের করা যাবে। এই প্রোগ্রামটি তিনভাবে লেখা যায়। প্রথমটিতে প্রোগ্রামের মধ্যেই লিখে দেওয়া যায় তার রানসংখ্যা :

10 LET RUN 1=52
20 LET RUN 2=21
30 LET RUN 3=36

এর ফলে প্রোগ্রামটি একটি খেলোয়াড়ের নির্দিষ্ট কিছু ম্যাচের তথ্য নিয়েই বিচার করা যাবে। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে এই কাজ অনেক সহজে লেখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। (ক্রমশ)

তথ্য অন্য ফ্লপিতে কপি করতে চাইলে নির্দেশ দাও
DISKCOPY B : A :
<R>
যদি তুমি একেবারে নতুন ফ্লপিতে কাজ করতে চাও প্রথমে তোমাকে ফরম্যাটিং করে নিতে হবে। A ড্রাইভে ফ্লপিটি ঢুকিয়ে লেখো FORMAT A :
<R> পরদায় ফুটে উঠবে
Insert new diskette for drive A : and strike ENTER when ready.
ড্রাইভে নতুন ফ্লপিটি যেহেতু রাখাই আছে <R> বা ENTER চাবিটি টেপো।
পরদায় ফুটে উঠবে Format another (Y/N) ? উত্তর দাও N টিপে।
ভুল করে প্রোগ্রামভরা ফ্লপিকে ফরম্যাটিং করলে সমস্ত প্রোগ্রামই মুছে যাবে।
এগুলোই হল ডিস্ক অপারেটিং সিস্টেম বা ডস-এর গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ। মনে রেখো IBM-এর মতো কম্পিউটারগুলোতেই এই নির্দেশগুলো কার্যকর করা যাবে। স্কুলের BBC কম্পিউটারে এইসব নির্দেশ খাটবে না।
বেসিক প্রোগ্রাম লিখতে গেলে A> চিহ্নের পাশে লিখতে হবে BASICA বা QB যদি তোমার বেসিক কম্পাইলারটি BASICA এবং QUICKBASIC-এর হয়।
এর ফলে পরদায় কিছু লেখা ফুটে উঠবে। শেষে ফুটে উঠবে :
OK
?
জিজ্ঞাসাচিহ্নের পাশ থেকে BASIC প্রোগ্রামটি লেখা শুরু করতে হবে।
প্রোগ্রাম লেখা শেষ হয়ে গেলে তাকে RUN করাতে হবে বিশেষ চাবি টিপে। প্রোগ্রামে ভুল থাকলে তা পরদায় ফুটে উঠবে। সংশোধন করার পর কম্পিউটার তোমার কাছে তথ্য চাইবে এবং ফল দেবে। এর পরে প্রোগ্রামটিকে NAME নামে স্থায়ীভাবে রক্ষা করার জন্য SAVE NAME নির্দেশ দিতে হবে। পরে আবার একে দিয়ে কাজ করাতে হলে LOAD "NAME নির্দেশ দিলেই চলবে।

কম্পিউটার ডিস্ক কার্টিজ ঢোকানো হচ্ছে—এভাবেই ফ্লপি ডিস্কও ঢোকানো হয়

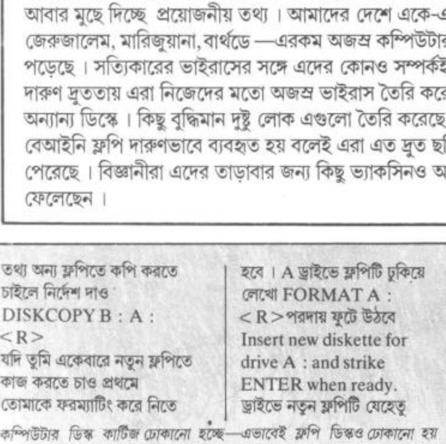

ছবি : দেবাশিস দেব

গল্প

বালিডাঙার মাঠ

মির্জানগরের মাঠ পেরিয়ে কানানদী পার হয়ে কিছু পথ গেলেই ডান দিকে যে পুকুরটা পড়বে সেই পুকুরকে এ-অঞ্চলের লোক এড়িয়ে চলে। কেননা, ভয়ঙ্কর পুকুর সেটা। সুরুকখানার পুকুর। পুকুরের চারপাশে ঘন বাঁশবন। গভীর কালো জল। পুকুর-ভর্তি মাছ কিন্তু ধরে না কেউ। এমনও প্রবাদ আছে এই পুকুর থেকে নাকি মাছরাঙায় মাছ নেয় না। সাপেও ব্যাঙ ধরে না। অথচ মেছো পুকুর। আদিবাসী সম্প্রদায়ের কিছু লোক বা যাযাবর বেদেনিরা দু-একবার চেষ্টা করেছিল এই পুকুরের পাশে বসবাস করে এর বদনাম ঘোচাতে। কিন্তু পারেনি। একরাত যে থেকেছে সেই বলেছে 'বাপরে বাপ'।

তা এই পুকুরকে নিয়ে কিন্তু আজকের এই গল্প নয়। বর্ধমানের মুছখানা মথুরাপুর থেকে হরিহর যাচ্ছিল ওর বোনের বাড়ি। অনেকদিন কোনও খবরাখবর না পেয়ে মনে মনে খুব উৎকণ্ঠিত হয়েছিল। এমন সময় হঠাৎই একজনের মুখে শুনতে পেল ওর বোনের নাকি খুব অসুখ। তাই আর একটুও দেরি না করে সে গামছায় দুটি মুড়ি বেঁধে রওনা হল বোনের বাড়ির দিকে।

হরিহর যে-পথে যাচ্ছিল সেই পথেই এই সুরুকখানা এবং বালিডাঙার মাঠ। তা এই দুটো জায়গাই ছিল খুব খারাপ। এখন বালিডাঙার মাঠ পার হতে পারলে খুব তাড়াতাড়ি ওর বোনের বাড়ি পৌঁছনো যায়। আর এই মাঠকে ত্যাগ করলে বা অন্য পথে ঘুরে গেলে তিন-চার মাইল পথ হাঁটা তো বেশিই হয় উপরন্তু বোনের বাড়ি পৌঁছতে রাতও হয়ে যায় খুব। তাই হরিহর মনের সঙ্গে অনেক বোঝাপড়া করে জেনেশুনেই এই বালিডাঙার মাঠে নামল।

ভূতের উপদ্রবের জন্য এ-মাঠে চাষও হয় না বলতে গেলে। আর লোকজনও থাকে না। হরিহর মাঠে নেমে দেখল, ধুধু করছে মাঠ। দিগন্তবিস্তৃত। চৈত্রের রোদ্দুরে লি-লি করছে যেন। এই দিনের আলোয় তাই ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। একবার জয়দুর্গা বলে কোনওরকমে মাঠটা পার হতে পারলেই নিশ্চিন্দি। রাতভিত হলে অবশ্য অন্য কথা ছিল। এখন এখানে ভয় কী? ভূতেরা আর যাই করুক দিনের বেলায় তো ভয় দেখাবে না। আর সত্যিই যদি ভয় দেখায় তো ভূত কী জিনিস তা স্বচক্ষে দেখাই যাবে। কেননা, ভূত আছে শুনেছে। অন্ধকারে পুকুরপাড়ে বনে-বাদাড়ে ভূতের ভয়ে গা ছম-ছম করে তাও জানে। কিন্তু ভূত ও নিজে কখনও দেখেনি, বা কেউ দেখেছে বলে শোনেনি। তা এই বালিডাঙার মাঠে এসে সত্যি-সত্যিই যদি ভূত দেখা যায় তো মন্দ কী?

হরিহর আপন মনেই এগিয়ে চলেছে। তা ছাড়া সত্যি বলতে কী, মনটাও ওর ভাল নেই। বহু কষ্ট করে বোনটার বিয়ে দিয়েছে ও। অথচ এই এক বছরের মধ্যে ওর এমন একটা অসুখের কথা শুনে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছে। তাই স্বাভাবিকের চেয়েও একটু দ্রুত পা চালিয়ে ও মাঠের ওপর দিয়ে পথ চলতে লাগল।

বেশ খানিকটা গেছে এমন সময় হঠাৎই মনে হল কে যেন ওর পেছন-পেছন আসছে। হরিহর একবার তাকিয়ে দেখল। কই, কেউ তো নেই। আবার চলা শুরু

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

করল। আবার ওই একইরকম মনে হল। ভারী মজার ব্যাপার তো।

এমন সময় হঠাৎ ওর সামনে কে যেন একজন পথ রোধ করে দাঁড়াল। দেখল কাস্তে হাতে এক কৃষাণ। মাথায় গামছার ফেট্টি বাঁধা। কৃষাণটি গম্ভীর গলায় বলল, "ওহে ও ছোকরা, বলি এই ভরদুপুরে বালিডাঙার মাঠ পার হয়ে যাচ্ছ কোথায়?"

হরিহর বলল, "আমার বোনের খুব অসুখ। তাই দেখতে যাচ্ছি।"

"কেন, আর কোনও পথ ছিল না?"

"সে-পথে গেলে রাত্রি হয়ে যাবে, তাই এই পথে যাচ্ছি। খুব বাড়াবাড়ি অসুখ কিনা।"

"বাড়াবাড়ি না ছাই। বুকে সর্দি বসে জ্বর হয়েছিল। এখন সেরে গেছে। ভালই আছে এখন। তুমি আর এগিও না। যেমন এসেছ তেমনই ফিরে যাও। হয় ঘুরে যাও, নয়তো ঘরে যাও।"

"তা কী করে হয় ভাই?"

"যা বলছি শোনো। আর এগিও না। আমাদের সভা চলছে এখন। গেলে অসুবিধে হবে। তোমার বোনের বাড়ির খবর ভাল।"

হরিহর বলল, "খবর ভাল হোক মন্দ হোক এত পথ কষ্ট করে এসেছি যখন ফিরে তো যাব না। আবার কাল কে আসে? যা হয় হবে। আমি যাবই।"

কৃষাণ বলল, "আমার কথা তা হলে শুনবে না তুমি?"

হরিহর ওর কথার উত্তর না দিয়েই এগিয়ে চলল। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পরই হঠাৎ ওর শরীরে কীরকম একটা শিহরন খেলে গেল। ও দেখল একটা প্রাচীন বটগাছের নীচে কতকগুলো কায়াহীন ছায়া গোল হয়ে বসে আছে। আর তাদের মাঝখানে বসে আছে গলায় হাড়ের মালা পরা আর-এক ছায়ামূর্তি। এই কি তবে ভূতের রাজা? আর এরা সবাই ভূত? ভূত ছাড়া এরা আর কীই-বা হতে পারে? কারও কোনও শরীর নেই। শুধু ছায়াগুলো রয়েছে।

হরিহর যেতেই ওদের সভার কাজ থেমে গেল।

সবাই চুপচাপ।

ভূতের রাজা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে হরিহরের দিকে তাকিয়ে বলল, "কে তুই! এমন আচমকা এসে পড়ে আমাদের সভার কাজ পণ্ড করলি কেন?"

হরিহর দারুণ ভয় পেয়ে বলল, "আজ্ঞে, আমি নিরুপায় হয়ে এই পথে এসে পড়েছি। তা ছাড়া আমি তো আপনাদের কোনও ক্ষতি করিনি। আমি তো এপাশ দিয়ে যাচ্ছি।"

"আমার কোনও লোক তোকে এ-পথে আসতে বারণ করেনি?"

"করেছিল। তবে সে যে আপনার লোক তা অবশ্য আমি জানতাম না।"

"সে আমারই লোক।"

ভূতের রাজা হরিহরকে আর কিছু বলল না, শুধু হাত নেড়ে দলের লোকেদের চলে যেতে বলে সবাই মিলিয়ে গেল। সেইদিন দুপুরে ঝাঁঝাঁ রোদ্দুরে একটু ঠাণ্ডা হাওয়া বইল শুধু। হরিহর বুঝল কাজটা সে সত্যিই ভাল করেনি।

হরিহরের একবার ভয় হল। আবার ভয়কে জয়ও করল সে। জীবনে এই প্রথম ভূত দেখল ও। তাও দিনদুপুরে। এ গল্প ও করবে কার কাছে? যাকে বলতে যাবে সেই তো হাসবে। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করুক আর না করুক হরিহর নিজে তো করেছে। হ্যাঁ, ভূত আছে। সত্যিই আছে। এবং সে ভূত জনশ্রুতির নয়, বাস্তবের। কেননা, সে নিজের চোখে ভূত দেখেছে।

যাই হোক, সন্ধের আগেই সে বোনের বাড়িতে পৌঁছল। হরিহরের মুখে সব কথা

শুনে ওর বোনের শ্বশুর এবং অন্যান্য লোকেরা সবাই খুব বকাবকি করল ওকে। সবাই বলল, "কাজটা খুব ভাল করোনি হরিহর। যে-পথে কেউ আসে না সে-পথে এই ভরদুপুরে কেন তুমি এলে ? তাও এলেই যখন ওই কৃষাণের নিষেধ তুমি উপেক্ষা করলে কেন ? এখন যদি তুমি ওদের কোপ-দৃষ্টিতে পড়ো তোমাকে রক্ষা করবে কে ?"

হরিহরের বোন বলল, "তা ছাড়া আমার সত্যি-সত্যিই কোন ভারী অসুখ হয়নি দাদা। সামান্য একটু জ্বরই হয়েছিল। বুকে সর্দি বসে জ্বর। কয়েকটা ইনজেকশন নিতেই সেরে গেছে। এদিকে অনেকদিন তুমি আসোনি বলে তোমার কোনও খবর-টবর না পেয়ে মনে দুঃখ হয়েছিল খুব। দারুণ অভিমান হয়েছিল। তাই আমাদের গ্রামের একজন লোক তোমাদের ওদিকে গেলে যাওয়ার সময় জিজ্ঞেস করেছিল, "বউমা, তোমার বাপের বাড়িতে কোনও খবর দিতে হবে ?" তা আমি বলেছিলাম, "না। কোনও খবরই দিতে হবে না। তবে দাদার সঙ্গে যদি দেখা হয়, কিছু যদি জিজ্ঞেস করে তখন বোলো যে, তোমার বোন মরতে বসেছে। তুমি সেই কথা শুনেই ছুটে এসেছ দাদা। কিন্তু এটা তুমি কী করলে ?"

যা হওয়ার তা হয়েই গেছে। কাজেই আর ভেবে-চিন্তে কোনও লাভ নেই। এখন ভালয়-ভালয় ওপথ ত্যাগ করে অন্য পথে বাড়ি ফিরতে পারলেই হয়। কিন্তু বাড়ি ফেরার আগে সেই রাতেই হরিহর দু-একবার রক্তবমি করে অসুস্থ হয়ে পড়ল। শুধু কি রক্ত-বমি ? সেইসঙ্গে প্রবল জ্বর আর ভুল বকা।

পরদিন সকালেই হরিহরের ইচ্ছেমতো ওর বোনের বাড়ির লোকেরা হরিহরকে গোরুর গাড়িতে শুইয়ে দেশে পাঠিয়ে দিল।

বালিডাঙা থেকে অত শরীর খারাপ নিয়ে মথুরাপুরে ফিরে এল বটে হরিহর, তবে কিনা কাজের কাজ কিছুই হল না। যত দিন যেতে লাগল ততই স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে লাগল ওর। বহু ডাক্তার বদ্যি ওঝা পত্তর করল। কিন্তু না। কিছুতেই কিছু হল না। হাজার রকমের তুকতাক, জলপড়া, ঝাড়ফুঁক সবই বৃথা হল।

অবশেষে এক সত্যিকারের গুনিনের সন্ধান পেল ওর বাড়ির লোকেরা।

গুনিনকে সন্তুষ্ট করে ডেকে আনতেই সব দেখে-শুনে গুনিন বললেন, "হ্যাঁ। আমি পারব এ ভূত ছাড়াতে। এ বড় জাঁদরেল ভূত। খুব রেগে গিয়ে ধরে আছে ওকে।"

তা গুনিনের ঝাড়ফুঁকে সত্যিই কাজ হল। দু-চারবার সরষে চৌয়া ছুঁড়ে মারতেই আর প্যাকাটির ফুঁ দিতেই "বাবা রে, মা রে" করে ভূত হরিহরকে ছেড়ে পালাতে পথ পেল না।

কিন্তু মুশকিল হল এই, গুনিন আসেন, ঝাড়ফুঁক করেন, ভূতও পালায়। কিন্তু যেই গুনিন বাড়ি ফেরেন ভূত এসে আবার ধরে।

বারবার যখন এইরকম হতে থাকে রোগীর বাড়ির লোকেরা তখন আবার ধরে গুনিনকে। বলে, "বাঁচান মশাই। মরে গেলুম। আর তো পারি না। আপনি গেলেই রোগী সুস্থ হয়। আর আপনি খালপার হলেই আবার ধরে রোগীকে।"

তা সেদিন গুনিন নিবারণ হালদারমশাই খুবই রেগে বললেন, "আজই তা হলে ও ব্যাটার শেষদিন হোক। ওর জন্য আমার কেন বদনাম হয়। তা ঠিক আছে, তোমরা যাও। আজ গিয়ে আমি এমন ওষুধ দেব যে, আর ওর ধারেকাছে কোনও ভূত কখনও আসতে সাহস করবে না। ও ভূত তো কোন ছার।" এই বলে হালদারমশাই তাঁর শেষ দাওয়াই ব্রহ্মকবচ হাতে নিয়ে রওনা হলেন রোগীর বাড়ির দিকে।

গ্রামসুদ্ধু লোক গুনিনের কেরামতি দেখবার জন্য হাঁ করে বসেছিল। গুনিন যেতেই হইহই করে উঠল সকলে।

হালদারমশাই বললেন, "না, আজ আর আমি কোনওরকম ঝাড়ফুঁক করব না। একটা রক্ষাকবচ পরিয়ে দেব শুধু। তারপর দেখব কোন ভূতে কী করে ওকে ধরে।"

গুনিনকে দেখেই ভূত পালাল।

সুস্থ লোকটির গলায় কবচ বেঁধে গুনিন বললেন, "এই তোমার রক্ষাকবচ বাবা। খুব যত্নে রেখো এটা। অন্তত বছরখানেক। আর তোমাকে ভূতে ধরবে না।"

হরিহর হালদারমশাইকে প্রণাম করল। এবং সত্যি-সত্যিই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সে। অর্থাৎ, সেদিন গুনিন চলে যাওয়ার পরেও আর তাকে কোনও ভূতেই ধরল না।

এই ব্যাপারে ওঝা হিসেবে নিবারণ হালদারের ধন্য-ধন্য পড়ে গেল চারদিকে। পড়বে নাই-বা কেন ? এমন বেয়াড়া ব্যাপার তো হামেশা ঘটে না। তা কে কবেই বা এসব দেখেছে। ওইরকম একটা ঢ্যাটা-ভূতকে জব্দ করা কি চাট্টিখানি কথা ? হালদারমশাইও তাই বিজয়গর্বে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন চারদিকে।

পরদিন সন্ধেবেলা ফাঁকা মাঠে একা পেয়ে ভূতেরা এসে ধরল হালদারমশাইকে। বলল, "হালদার, তুই মস্ত গুনিন। গুনিনের সেরা গুনিন। কিন্তু আমাদের পেছনে লেগে তুই খুব একটা ভাল করলি না। এখনও বলছি আমাদের শিকার আমাদের হাতে তুলে দে।"

হালদার বললেন, "থাম ব্যাটারা। আমি নিবারণ হালদার। আমার সঙ্গে লাগতে আসিস না। আর ওকে তোদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তা হলে এই যে দেশময় ধন্যি-ধন্যি পড়ে গেছে আমার নামে, সব তা হলে বৃথা হয়ে যাবে। তোরা অন্য কাউকে ধর। আমি তাকে ছাড়াব না।"

"হরিহর আমাদের শিকার। আমরা খুব রেগে আছি ওর ওপর। কাজেই ওকে ছাড়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।"

"তাতে আমার কী ? হরিহরকে ভাল করে আমার দেশজোড়া খ্যাতি। এ সুনাম আমিও হারাতে চাই না।"

ভূতেরা বলল, "আমাদের কথা তুই শুনবি না তা হলে ?"

"না।"

"ঠিক আছে। আমরাও এর বদলা নেব। তোর একটি মাত্র ছেলে তো ? আনাচে-কানাচে যেখানে-সেখানে ঘোরে। আমরা তার গলা টিপে মারব। তবে তোকে আমরা আর একবার ভেবে দেখার সময়

দিলাম।"

"তোদের যা ইচ্ছে কর।"

"তা তো করব। কিন্তু এখনও বলছি হালদার, ওই কবচ তুই খুলে নিয়ে আয়।"

"সম্ভব নয়।"

"তা হলে ধরলাম তোর ছেলেকে। তোর ছেলে এখন পুকুরপাড়ে ওর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে। ধরলাম ওকে। এখনই বেশি ক্ষতি করব না। তবে ঘাড়টা একটু ব্যথা করে দেব।" বলে একটু নীরবতার পর আবার বলল, "তোর ছেলের মুখ দিয়ে এখন রক্ত উঠছে হালদার। তাড়াতাড়ি যা। তবে তুই যাওয়ার আগেই আমরা ওকে ছেড়ে দেব।" এই কথা বলেই ভূতেরা বেপাত্তা।

আর নিবারণ হালদারও দারুণ ভয় পেয়ে ছুটলেন সেই পুকুরপাড়ে তাঁর ছেলের কাছে। ওই তো। ওই তো তাঁর ছেলেকে ঘিরে

সবাই কেমন গোল হয়ে বসে আছে। তবে কি সত্যিই ভূতেরা ধরল ওকে?

হালদারমশাই গিয়ে ঝাড়ফুঁক করে জল পড়া দিয়ে ছেলেকে ঘরে আনলেন। ছেলের তখন প্রবল জ্বর। অনবরত ভুল বকছে। শুধু বলছে, "ও বাবা গো! কী বড় বড় চোখ। ও বাবা গো! আমাকে কামড়াতে আসছে। আমি মরে যাব বাবা গো। ওই দ্যাখো, আমার কষ্ট সাজাচ্ছে।"

হালদারমশাই দেখলেন গতিক সুবিধের নয়। তাঁর যত রকম বিদ্যে জানা ছিল প্রয়োগ করে ছেলেকে তিনি সুস্থ করবার চেষ্টা করলেন। অবশেষে অনেক চেষ্টার পর একটু সুস্থ হল ছেলেটি।

পরদিন সন্ধেবেলা ভূতেরা আবার হালদারমশাইকে বলল, "কী গুনিন, দেখলি তো আমাদের মহিমা? আমরা যা বলি তা করি। এখনও সময় আছে কিন্তু। তোর ছেলেকে শুধু ধরেই একটু মোচড় দিয়ে ছেড়ে দিয়েছি। এবার কিন্তু জানে মেরে দেব। ভেবে দ্যাখ কী করবি? তোর কাছে খ্যাতি বড় না ছেলে বড়? ভেবে দ্যাখ, তোর কিন্তু ওই একটিমাত্র ছেলে।"

হালদার বললেন, "আমার কাছে খ্যাতিই বড়। ছেলে নয়।"

"ঠিক আছে। হরিহরের বদলাটা তোর ছেলেকে দিয়েই নিতে হবে দেখছি। তবে আর একবার সুযোগ তোকে দেব।"

হালদার চিন্তান্বিত হয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। চিন্তার কারণ আছে বইকী। হতচ্ছাড়া ভূতগুলো আগে যদি কিছু বলত তখন না হয় চিন্তা করে দেখা যেত। কিন্তু এখন নিজের হাতে লোকের গলায় কবচ বেঁধে সেই কবচ খুলে আনবে কী করে? এদিকে ওদের যত রাগ এখন ছেলেটার ওপর পড়েছে। হালদারমশাইয়ের সব কিছু কেমন যেন গোলমাল হয়ে যেতে লাগল।

বাড়ি ফিরতেই হালদারমশাইয়ের স্ত্রী তো কেঁদে এসে হালদারের পা দুটি জড়িয়ে ধরলেন।

হালদার বললেন, "কী ব্যাপার! হল কী তোমার? কাঁদছ কেন?"

"তার আগে বলো, তোমার কি সত্যি-সত্যিই মতিচ্ছন্ন হয়েছে?"

"তার মানে?"

"তার মানে তুমি ভালরকমই জানো।"

"আরে! কী হল বলবে তো?"

"কী হল তুমি জানো না? এই তো একটু আগে পুকুরঘাটে আমাকে দেখা দিয়ে ওরা বলে গেল তুমি নাকি ওদের কথায় রাজি হচ্ছ না? ওরা বলছে এখনও সময় আছে, হালদারমশাইকে একটু বুঝিয়ে বলো যেন ওই কবচটা কালই গিয়ে খুলে নিয়ে আসে। ওরা এ-কথাও বলেছে, আমরা সচরাচর কারও ক্ষতি করি না। ওই লোকটাকে বারণ করা সত্ত্বেও আমাদের জরুরি মিটিং-এর দিন ও জোর করে ওই মাঠে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, ওরা বারবার বলেছে তুমি ওঝাগিরি করছ বলে ওদের কোনও রাগ নেই তোমার ওপর কিন্তু ওদের কথা তুমি যদি না শোনো, যদি তুমি ওদের মুখের গ্রাস ফিরিয়ে না দাও তা হলে তোমার ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যই ওরা তোমার ছেলেকে মারবে। আমাকে মারবে। এখন বলো তোমার এত দরদ কেন ওদের ওপর? কিসের এত জেদ তোমার? শুধু তোমার গোঁয়ার্তুমির জন্যই না ওরা আমার ছেলেটার মুখ দিয়ে শুধু-শুধু রক্ত ওঠাল। সব জেনেশুনেও চুপ করে আছ তুমি? তুমি বাপ না পিশাচ?"

হালদারমশাই এবার রীতিমত ভয় পেয়ে বললেন, "ওরা বুঝি এইসব কথা বলেছে তোমাকে?"

"না বললে জানলাম কী করে বলো?"

"কিন্তু মুশকিল হয়েছে কী জানো, আমি ওই কবচ কী করে খুলে আনব?"

"কেন? কাল সকালেই তুমি অন্য একটা বাজে কবচ হাতে নিয়ে ওদের বাড়ি যাও। তারপর গিয়ে বলো, এই নতুন কবচটা আরও বেশি জোরালো। এই কথা বলে আসল কবচটা খুলে নিয়ে নকল কবচ পরিয়ে চলে এসো। ভূতেরা বলেছে ওই কবচ খুলে নিয়ে তুমি ঘরে ফিরলেই ওরা আর এক মুহূর্ত দেরি না করে মেরে ফেলবে লোকটাকে। ঝামেলা একেবারেই চুকে যাবে।"

হালদারমশাই বললেন, "বেশ। তাই করব। ওরা আবার এলে এই কথাই তুমি বলে দিও।"

হালদারগিন্নি দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকালেন।

পরদিন সকালে হালদামশাই নতুন একটি কবচ নিয়ে আবার গেলেন মথুরাপুরে। হরিহর তখন গোয়ালে গোরু-বাছুরের দেখাশোনা করছিল। হালদারমশাইকে দেখেই এগিয়ে এল সে, "ব্যাপার কী হালদারমশাই ?"

হালদারমশাই বললেন, "ব্যাপার কিছুই নয়। শুধু দেখতে এলাম আর কোনও অসুবিধে হচ্ছে কি না।"

"কী যে বলেন। আপনার দেওয়া কবচ গলায় বেঁধে রেখেছি। ভূত তো ভূত, ভূতের বাবারও আর সাধ্য নেই যে এখানে আসে।"

"ঠিক আছে। এখন ওই কবচটা তুমি আমাকে ফেরত দাও।"

"সে কী !"

"ভয় নেই। এই কবচের বদলে তোমাকে আর একটা এমন কবচ দেব যে তা আরও সাঙ্ঘাতিক। এই কবচটা তো শুধু তোমাকেই রক্ষা করবে। কিন্তু এই নতুন কবচ রক্ষা করবে তোমার পুরো পরিবারকে।"

এই কথা শুনে হরিহর সরল বিশ্বাসে কবচটা খুলে দিল হালদারমশাইকে। তাঁরই দেওয়া জিনিস তিনি ফিরিয়ে নেবেন, এতে অবিশ্বাস করার কিছু নেই। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আবার হয়তো একদিন নতুন কোনও কবচ দেবেন। এরকম তো হতেই পারে। তাই সরল বিশ্বাসে কবচটা হালদারমশাইকে দিয়ে দিল হরিহর।

হালদারমশাই নিজে হাতে ওর গলা থেকে রক্ষা কবচটি খুলে নিয়ে নতুন একটি নকল কবচ বেঁধে দিলেন। তারপর ভগবানের নাম স্মরণ করে বেরিয়ে এলেন ওদের বাড়ি থেকে।

মথুরাপুরের সীমানা যেই পেরিয়েছেন অমনি শুনতে পেলেন কে যেন বলল, "আমাদের রাজা তোর ওপর খুব খুশি হয়েছে গুনিন। আমরা তোর ওপর সন্তুষ্ট। আর তোর বউ-ছেলের কোনও ভয় নেই। এখন ওরা নির্ভয়ে চলাফেরা করতে পারবে। তোর ছেলের ওপর থেকে আমাদের দৃষ্টি সরিয়ে নিচ্ছি। আর এও বলে রাখছি আমরা যদি কাউকে কখনও ধরি আর ওঝা হয়ে তুই যদি সেখানে যাস তা হলে তোকে দেখা মাত্রই আমরা তাকে ছেড়ে দেব।"

হালদারমশাই নিশ্চিন্ত হলেন। একজন রোগীকে সারাতে না পারলেও এরকম অনেক রোগীকে যদি উনি বাঁচাতে পারেন সেটাই বা মন্দ কী ! তাঁর কর্মদক্ষতা তাতে কিছুমাত্র কমবে না। বরং উত্তরোত্তর সুনাম বৃদ্ধিই পেতে থাকবে।

ওদিকে হালদারমশাই চলে আসামাত্রই হরিহরও হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। ওর বাড়ির লোকেরা দেখল হরিহরের মুখটা কেমন যেন বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। হরিহর কথা বলতে পারছে না। দুটো চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে। এক অদ্ভুত আতঙ্কে নীল হয়ে আসছে ক্রমশ। বাড়ির লোকেরা দেখতে না পেলেও হরিহর বেশ বুঝতে পারল কালো পোড়া দুটো হাত ওর গলা টিপে ওকে মেরে ফেলতে চাইছে। হরিহরের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। ও ধীরে-ধীরে লুটিয়ে পড়ল মাটির বুকে। ওর মুখ দিয়ে এক ঝলক রক্ত বেরিয়ে এল। তারপর ওর প্রাণহীন দেহটা লুটিয়ে পড়ল মাটির বুকে।

ওর বাড়ির লোকেরা গুনিনকে ডাকতে ছুটল। নিবারণগুনিন বাড়িতেই ছিলেন, সব শুনে এবার কিন্তু তিনি ঋজু হয়ে দাঁড়ালেন। স্ত্রীর নিষেধও এবার তিনি শুনলেন না। বললেন, "আমি যাব, নকল রক্ষাকবচ দিয়ে হরিহরের যে ক্ষতি করেছি তার প্রায়শ্চিত করব। এবং আরও অনেক-অনেক রক্ষাকবচ তৈরি করব, কাউকেই ভূতের হাতে মরতে দেব না।"

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

কবিতা

সত্যি কথা

প্রদীপ ঘোষ

উপরে উঠতে গিয়ে
সিঁড়ি গোনে ক'জনা,
খবর নিয়েছি ঠিক
একশোতে ন'জনা।
চারপাশে চোখ খোলা
রেখে চলে সকলে,
ক'জনে বলতে পারে
না দেখে যে নকল এ।
সকলেই ভাবে আমি
চিনি জানি সব দিক
খোঁজ নিলে দেখা যাবে
জানে না সে ঠিক ঠিক।
তবু যদি বলে কেউ
আমি সবজান্তা,
জানে না সে নুন কী যে,
কাকে বলে পান্তা।
এত কিছু জানবার
আছে ভাই দেশে রে,
শেখো ভাই মন দিয়ে
আর ভালবেসে রে।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

তেলের খোঁজে তোলপাড়

মাটির নীচে আছে অফুরন্ত তেলের ভাণ্ডার। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সেই তেল অনুসন্ধান করে কীভাবে তুলে আনা হয় সে-বিষয়ে লিখেছেন সুজাতা পাষ্টী সরকার

জাহাজ, ট্রেন, গাড়ি, প্লেন, সাবান, রং, প্লাস্টিক সবকিছুই আজ জীবনযাপনের অঙ্গ । কিন্তু ব্যবহারের সময় একবারও কি মনে পড়ে, এসবের উৎস কোথায় । এ-সবই এমন একটি উপাদান দিয়ে তৈরি, যার নাম 'হাইড্রোকার্বন' । কার্বন ও হাইড্রোজেনের সমন্বয়ে গঠিত । বিভিন্ন ধরনের হাইড্রোকার্বনকেই কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে পাওয়া যায় একটি অতি প্রয়োজনীয় তরল পেট্রোলিয়াম বা কালো তরল সোনা, যার খোঁজে তৈলসন্ধানীরা তোলপাড় করে ফেলছেন সারা পৃথিবী । অভিযান চলছে মাটির তলায়, সমুদ্র আর আন্টার্কটিকার হাজার ফুট জমাট বরফের নীচে । প্রকৃতির এই দানকে মানুষ নিজের কাজে লাগাতে শিখেছে, আজ নয়, বহুযুগ আগে । আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে মেসোপটেমিয়ানরা বাড়ি তৈরি করবার জন্য ব্যবহার করত অ্যাসফল্ট । গ্রিক উপকথায়, মিডিয়া তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পুড়িয়ে মারতে আগুন জ্বেলেছিল ন্যাপথা তেলে । সম্রাট নিরোর আমলে সিসিলি দ্বীপে আলো জ্বলত অলিভ অয়েলের বদলে পেট্রোলিয়ামে । বর্তমানে মানুষ পেট্রোলিয়ামকে নানাভাবে ব্যবহার করবার আরও বহু নতুন পন্থা আবিষ্কার করেছে । তাই বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে পেট্রোল আজ নিত্যদিনের সঙ্গী । বাণিজ্যিক প্রয়োজনে পৃথিবীর গভীর অন্ধকার থেকে এই খনিজ তরলটিকে আলোয় আনবার প্রথম কৃতিত্ব যাঁর প্রাপ্য,তাঁর নাম এডউইন ড্রেক । পোশাকি নামে নয়, তিনি পরিচিত ছিলেন 'কর্নেল' নামে ।

কানেকটিকাটের একটি তেল কম্পানি তাঁকে নিযুক্ত করেছিল সমস্ত অঞ্চলটা সমীক্ষা করে দেখতে, যদি কোথাও তেল পাওয়া যায় । এটি পেশা হলেও মানুষটির আসল নেশা ছিল পৃথিবীর অন্দরমহল খুঁটিয়ে দেখা । সেই

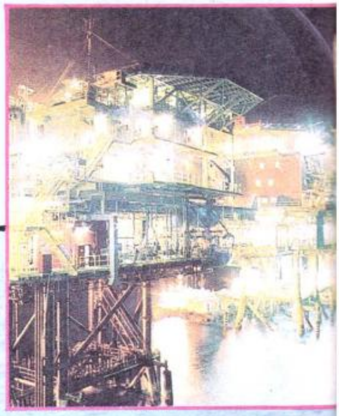

বোম্বাই দরিয়ায় তেলের অনুসন্ধান।(ইনসেট) রাত্রেও কাজ থেমে নেই

ভাবেই দিনের পর দিন, এখানে-সেখানে খুঁড়তে-খুঁড়তে হঠাৎই ১৮৫৯ সালের ২৭ অগস্ট, পেনসিলভেনিয়ায় মাত্র ৬৯$\frac{1}{2}$-ফুট কূপ খুঁড়ে সন্ধান পেয়ে গেলেন তরল মহার্ঘ্য বস্তুটির। তেল নিয়ে আজ যাঁরা বাণিজ্য করেন, তাঁদের ইতিহাসে, একশো তিরিশ বছর আগের সেই দিনটি সোনার জলে লেখা হয়ে গেল। সেই প্রথম ব্যারেলের পর আজ সারা পৃথিবীতে গড়ে প্রতিদিন প্রায় ৪০০,০০০ ব্যারেল তেল তোলা হচ্ছে। আর আশ্চর্যের ব্যাপার হল, এই তেল সেদিনও আজকের মতোই দুর্মূল্য ছিল। ড্রেকসাহেবের প্রথম ব্যারেলটি বিক্রি হয়েছিল কুড়ি ডলারে। যা কিনা ১৯৮৮ সালের ২৬০ মার্কিন ডলারের সমান।

তেল তুলে আনবার জন্য এডউইন ড্রেক যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন, তা অতি সাধারণ। আগে সেইভাবে লবণ জাতীয় খনিজ আহরণ করা হত। কিন্তু এই অভিযানে বিপুল সাড়া পড়ে গেল পৃথিবীতে। ক্রমে আবিষ্কৃত হল নানা ধরনের যন্ত্র। শুধুমাত্র তেল আবিষ্কারকে কেন্দ্র করে প্রসারিত হল বিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা। পেট্রোলিয়াম জিওলজি। নিত্যনতুন পরীক্ষা চালিয়ে এই বিভাগের বিশেষজ্ঞরা হদিস দিতে লাগলেন মাটির তলার সঠিক জায়গাটির, যেখানে আছে তেলের অফুরন্ত ভাণ্ডার। মধ্য প্রাচ্য, মেকসিকো, ইরাক, রাশিয়া, আমেরিকার বহু জায়গায় পাওয়া গেল তেলের সন্ধান। পৃথিবীর অভ্যন্তর চিরকালই রহস্যাবৃত। ওপর থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই, ভেতরে কী জমা আছে। শুধু অনুমান করা যায় মাত্র। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত তৈল আবিষ্কারক ডেভি কিংসটন একটি সুন্দর মন্তব্য করেছেন। তেল খুঁজে বের করার চেষ্টা যেন কোনও জমাট ডিটেকটিভ বই পড়ার মতন। যে বইয়ের বেশিরভাগ পাতাই ছেঁড়া, অনেকটাই অনুমান করে নিতে হয়, খুনি ধরা পড়ল কী করে, কিংবা খুনি কে, তেমন করেই শুরু হয় তরল পদার্থটির অনুসন্ধান। তেল মূলত ভাসমান। তাকে ধরে রাখবার জন্য প্রয়োজন পুরু আধারের। শুধু তাই নয়। তার ওপরে থাকবে এমন এক আস্তরণ যা সেই তেলকে উবে যাওয়া বা গড়িয়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করবে। এমনটি সম্ভব কেবলমাত্র পাললিক শিলাস্তরেই। পৃথিবীতে প্রথম যেসব শিলা গঠিত হয়েছিল তা প্রচুর বৃষ্টি, তাপ, ভূমিকম্প ইত্যাদি কারণে ক্ষয় হয়ে বালি, কাঁকর, কাদায় পরিণত হয়। সেগুলি আবার

মরুভূমিতে তেলের খোঁজে পাঠানো হয় ভাইব্রেটর ট্রাক

“

তেলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হলে শুরু হয় ড্রিলিং। ভূপৃষ্ঠ বা সমুদ্রে ড্রিলিং বা কূপ খননই একমাত্র উপায়, যা থেকে বোঝা যায় তলায় কী আছে। সাধারণত ভূস্তরে তেলের সন্ধান পেলে শুরু হয় 'রোটারি ড্রিলিং' প্রথায় কূপ খনন।

”

নদীস্রোত, হিমবাহ, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টির জলের সঙ্গে বাহিত হয়ে সঞ্চিত হয় সমুদ্র, হ্রদ, নদীর তলদেশে। কালক্রমে উপরের বিরাট জলরাশি ও পলিস্তরের ভীষণ চাপে এবং ভূগর্ভের তাপে নীচের স্তরগুলি ক্রমশ জমাট বেঁধে পরিণত হয় শিলায়। অনেক সময় আবার সমুদ্রের তলায় এই শিলাস্তরের মধ্যে জমা হয় উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃতদেহ। পরবর্তী সময়ে নতুন পলিস্তর ওই মৃত প্রাণী বা উদ্ভিদকে আবৃত করে ফেলে। বহু বছর ধরে শিলার মধ্যে প্রাণীর দেহাবশেষ এভাবে প্রোথিত হয়ে উপরের চাপ ও অভ্যন্তরের তাপে বিভিন্ন ধরনের হাইড্রোজেন ও কার্বনের মিশ্রণে পরিণত হয়। এটি যখন তরল অবস্থায় থাকে, তখন তাকে আমরা বলি খনিজ তেল বা পেট্রোলিয়াম। এজন্যেই প্রধানত পাললিক শিলাস্তরে এই বিশেষ তরলটি পাওয়া যায়।

ভূবিজ্ঞানীরা তাই রহস্য-সন্ধানীর মতো প্রায়ই সমুদ্রগর্ভে অনুসন্ধান চালান।

তেল খুঁজে বের করা কাজটি নেহাত সহজসাধ্য নয়। সময়সাপেক্ষ অনুসন্ধানটির জন্য প্রয়োজন যথেষ্ট অর্থবল ও ভূতাত্ত্বিক জ্ঞান। অনুসন্ধান চালাবার জন্য বিজ্ঞানীরা বেছে নেন বিশেষ কয়েকটি পদ্ধতি। প্রথমেই তাঁদের নির্বাচন করতে হয় সমুদ্র, নদী বা উপকূলবর্তী কোনও জায়গা, যার তলদেশে

আছে পাললিক শিলাস্তর। তারপর তাঁরা সেই জায়গার মাটি ও পাথরের টুকরো ল্যাবরেটরিতে বিশ্লেষণ করে দেখেন, তার মধ্যে কী জাতীয় খনিজ পদার্থ বা প্রস্তরীভূত জীবাশ্ম আছে। তার থেকে অনুমান করা যায়, এই পাললিক শিলাস্তরে কোনও তেল পাওয়া যাবে কি না। বর্তমানে প্রস্তরীভূত জমির বৈশিষ্ট্য বুঝতে বিজ্ঞানীরা অনেক সময়ই সাহায্য নিচ্ছেন গ্রাভিমিটার বা ম্যাগনেটোমিটারের। গ্রাভিমিটার নামে যন্ত্রটি ভূপৃষ্ঠ বা সমুদ্রের ওপর অভিকর্ষবলের সূক্ষ্ম তারতম্যের হিসেব কষে তরল তেলের সন্ধান দেয়। আর ম্যাগনেটোমিটারের সাহায্যে পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের প্রাবল্যের সূক্ষ্ম তারতম্য ধরা যায়। কোনও জায়গার চৌম্বক তারতম্যের সৃষ্টি হয় সাধারণত নিম্নস্থ শিলার চৌম্বকধর্মের পার্থক্যের জন্য। সুতরাং এই পদ্ধতিতে জানা যায়, নিম্নস্থ শিলাস্তরটি কী জাতীয়। এ ছাড়াও, বর্তমানে আর একটি পদ্ধতি তৈল-বিজ্ঞানীদের কাছে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। সেটি হল 'সিসমিক মেথড'। এই পদ্ধতিতে ওপর থেকে ডিনামাইট দিয়ে ভূ-কম্পন ঘটানো হয়। এই কম্পনের সাহায্যে কোনও ধ্বনিসংকেত পাঠালে সেটি প্রস্তরখণ্ডে ধাক্কা খেয়ে যখন ফিরে আসে, তখন তার গতিবিধির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে বোঝা যায় তেল সেখানে থাকা সম্ভব কি না। একইভাবে সমুদ্রের নীচে থেকে ফিরে আসা ধ্বনিসংকেত হাইড্রোফোন ও ম্যাগনেটিভ টেপরেকর্ডারে ধরে নিয়ে বোঝা যায়, সমুদ্রের তলার সেই বিশেষ জায়গাটিতে তেলের অবস্থান।

তেলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হলে শুরু হয় ড্রিলিং। ভূপৃষ্ঠ বা সমুদ্রে ড্রিলিং বা কূপ খননই একমাত্র উপায়, যা থেকে বোঝা যায় তলায় কী আছে। সাধারণত ভূস্তরে তেলের সন্ধান পেলে শুরু হয় 'রোটারি ড্রিলিং' প্রথায় কূপ খনন। আর সমুদ্রের তলায় তেলের হদিস পেলে কাজ করতে হয় সিট-অন-বটম বার্জেস বা ভাসমান প্ল্যাটফর্ম থেকে। এখান থেকে জ্যাক-আপ, সেমি-সাবমারসিব্‌ল ও ড্রিলশিপ এই তিন উপায়ে খননকার্য চলে জলের নীচে।

এই প্রাকৃতিক সম্পদটির জোগান সীমায়িত। তাই এর নানাপ্রকার ব্যবহার আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিদিন তেলের দাম বেড়ে যাচ্ছে হু-হু করে। শুধুমাত্র কয়েকটি তেলের খনি কোনও দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে কতটা স্থিতিশীলতা দিতে পারে, তার উজ্জ্বল প্রমাণ ইরাক, ইরান বা আরব। এই দেশগুলির শিল্প, বাণিজ্য, অর্থনীতি, বৈদেশিক সম্পর্ক তথা জীবনযাত্রা—সমস্ত কিছু আবর্তিত হচ্ছে এই তরল সোনাকে ঘিরে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এর প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬০ সালে পৃথিবীর মুখ্য তেল উৎপাদনকারী দেশগুলি একত্র হয়ে গঠন করেছে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা—ওপেক (অরগানাইজেশান অব পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্টিং কানট্রিজ)। সঙ্ঘটি সারা পৃথিবীর তেলের দামের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা করে চলেছে। ১৮৬৭ সালে অসমের মাকুম-এ তেল পাওয়ার পর ভারতে তেল একটি শিল্পজ পণ্য হিসেবে প্রথম চিহ্নিত হয়। স্বাধীনতার আগে শুধু অসম থেকেই পাওয়া যেত ০·২৫ মিলিয়ন টন তেল। ১৯৫৬ সালের ১৪ অগস্ট প্রতিষ্ঠিত হয় ভারত সরকারের সংস্থা—অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশন বা ও·এন·জি·সি·। খনিজাত তেলকে প্রয়োজনে ব্যবহার করতে ও বাণিজ্যিক মাত্রা দিতে এঁরাই উদ্যোগী হয়ে ভারতে প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেল খুঁজে বের করবার দায়িত্ব নিলেন। প্রথম প্রচেষ্টাতেই ১৯৫৮ সালে গুজরাতের কাম্বেতে তেল পাওয়া গেল। তারপরও ও·এন·জি·সি·-র অনুসন্ধান অব্যাহত আছে। এঁরা অনুসন্ধান চালিয়ে অসমে ১৯৬০, বম্বে হাই-এ ১৯৭৪ সালে, কৃষ্ণা গোদাবরীর উপকূলে ১৯৮০ সালে, কাবেরীর উপকূলে ১৯৮১ সালে, কৃষ্ণা গোদাবরীর পাশের অঞ্চলে ১৯৮৩ সালে এবং গান্ধারে ১৯৮৪ সালে তুলে আনেন কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি। আমাদের সারা ভারতে ১,৭২০,০০০ বর্গ কি· মি· এলাকা জুড়ে রয়েছে পাললিক শিলাস্তর। সুতরাং ভারতের তেলের ভাণ্ডারটি খুব ছোট নয়। এখন অপেক্ষা শুধু সঠিক জায়গা নির্ধারণের। এর মধ্যে সমুদ্রের তলায় আছে ৩৮০,০০০ বর্গ কি· মি· স্তরীভূত শিলা। তেল পাওয়ার সম্ভাবনা অনুসারে ও· এন· জি· সি· সমগ্র এলাকাকে ভাগ করেছেন চারটি স্তরে। এর মধ্যে প্রথম স্তরে রেখেছেন কাম্বে, উত্তর অসম, কাবেরী, কৃষ্ণা ও গোদাবরীর উপকূল, অসম আরাকান এবং বম্বের কাছাকাছি দরিয়া। সারা ভারতের মোট ২৬টি

ড্রিলিং রিগ কাজ করে চলে দিনরাত

আলাস্কায় বরফ খুঁড়ে তেল খোঁজা হচ্ছে, পোলার ভালুক আসতে পারে তাই প্রহরা

জ্যাক-আপ-রিগ 'হাকুর্য-৯' । স্থলভাগের সঙ্গে এই জ্যাক-আপ-রিগটির সংযোগ বজায় রাখার জন্য সর্বদা মজুত আছে দুটি জাহাজ ও একটি হেলিকপ্টার । এ ছাড়াও কাজের সুবিধের জন্য এঁরা পোর্ট ট্রাস্টের কাছ থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদে লিজ নিয়েছেন হলদিয়া ডক কমপ্লেকসের একটি জেটি । রিগটির অনুসন্ধানক্ষমতা ৬০০০ মিটার পর্যন্ত । এর পাশাপাশি আরও পাঁচটি স্থান চিহ্নিত হয়েছে ড্রিলিং-এর জন্য ।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ পর্যায়ে ভারতের অপরিশোধিত তেলের উৎপাদন প্রায় ৩০ মিলিয়ন টন হলেও পেট্রোলিয়াম শোধনের ব্যবস্থা এখনও পর্যাপ্ত নয় । বর্তমানে আই· ও· সি·, বি· পি· সি· এল ইত্যাদি ছ'টি সংস্থা তেল শোধনের ব্যবস্থা নিয়েছেন । এর মধ্যে আই· ও· সি'রই আছে নিজস্ব ছ'টি কারখানা । পেট্রোলিয়াম শোধন করে পাওয়া যাচ্ছে পেট্রোল, ডিজেল, যা আজকের গতির যুগে একান্ত অপরিহার্য । এ ছাড়া কেরোসিন বা ন্যাপথা অয়েল, প্যারাফিন, লুব্রিকেটিং অয়েল, ওয়াকস, অ্যাসফল্ট ইত্যাদিও পাওয়া গেছে । এ ছাড়াও

পাললিক স্তরের মধ্যে আপাতত এঁরা প্রাথমিক গুরুত্ব দিচ্ছেন তেরোটির ওপর । তবে তেল অনুসন্ধানের ব্যাপারে সংস্থাটি বেশ আলোড়ন তুলেছে । সারা পৃথিবীতে যেখানে অল্প কিছু কূপ খনন করে তেলের দেখা মিলেছে সামান্যই, সেখানে ও·এন·জি· সি· গড়ে পাঁচটির মধ্যে তিনটি কূপ থেকেই তুলে আনছেন লাভের রসদ ।

১৯৮৮-'৮৯ সালে এই সংস্থা অভিযান চালিয়ে আঠারোটি নতুন জায়গায় তেলের সন্ধান পেয়েছেন, কাজকে ত্বরান্বিত করতে তাঁদের ১১৬টি রিগের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে ১৯টি নতুন রিগ । এ ছাড়াও সমুদ্রের তলা থেকে তেল আহরণের জন্য সম্প্রতি এসেছে একটি বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন জ্যাক-আপ-রিগ 'সাগর-কিরণ' । ১৯৮৭-'৮৮তে অপরিশোধিত তেলের উৎপাদন ছিল ২৭·৯১ মিলিয়ন টন । ১৯৮৮-'৮৯ সালে সেটি বেড়ে দাঁড়ায় ২৯·২৮ মিলিয়ন টন । কিন্তু এতেও উৎপাদনের সঙ্গে চাহিদার সামঞ্জস্য থাকছে না । সম্প্রতি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়েছে প্রায় দু' কোটি টন তেল ও ৪০-৫০ লক্ষ টন পেট্রোলিয়ামজাত বস্তু । কিছুদিন আগে পর্যন্ত অনেকেই অভিযোগ করেছিলেন পশ্চিমবাংলার প্রতি ও· এন·জি· সি· কিছুটা উদাসীন । তেল পাওয়ার সম্ভাবনায় দ্বিতীয়

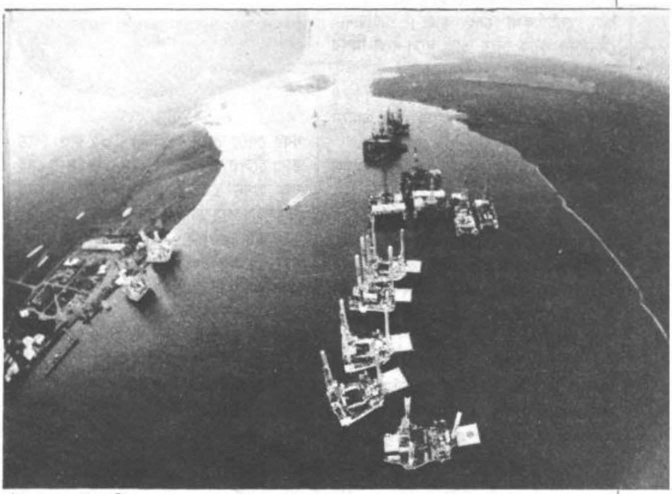

টেক্সাসের সাবাইন নদীর তলায় চলেছে তেলের অনুসন্ধান

স্তরে আছে পশ্চিমবঙ্গ । কিন্তু ১৯৮৬ সালের ১৮ ডিসেম্বর বঙ্গোপসাগরে তেল অনুসন্ধানের ব্যাপারে এঁরা সর্বাধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন । নিয়োগ করেছেন তিনটি স্তম্ভবিশিষ্ট একটি অত্যাধুনিক জাপানি

দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে আরও কিছু পেট্রোলিয়ামজাত সামগ্রী। যেমন, সিন্থেটিক কাপড়, নাইলন, টেরিলিন, সিন্থেটিক রাবার, কীটনাশক পদার্থ বা রোগ নিরাময়ের বিভিন্ন ওষুধ ।

ফোটো : ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক-এর সৌজন্যে

গল্প

মেঘলা আবহাওয়া । খবরে জানিয়েছে বৃষ্টি হতে পারে । বাইরে বের হওয়ার উপায় নেই । এর মধ্যেও আসর বসেছিল ঠিকই । যেমন বসে অন্যদিন । আসরের মধ্যমণি অবশ্যই সিকদারসাহেব । সিকদারসাহেব গল্প বলছিলেন । তাঁকে ঘিরে বসেছে ভুতো, অনু মণি, মাম্পু আর টুকু । মানে পাড়ার ক'টি ছেলেমেয়ে । আসলে তাদের সিকদারদাদু গল্প বলতে ভালবাসেন আর তারাও শুনতে চায় ।

সিকদারসাহেব সেদিন তাঁর গল্প বলে চলেছেন তখনও । সে গল্প ইতিহাসের কথা । "বুঝলে, তারপর কী হল ?" এটুকু বলেই তিনি আবারও থামলেন । সকলের মুখের দিকে তাকালেন । দেখলেন, সবাই শেষটুকু শোনার জন্য ব্যস্ত । তিনি ফের শুরু করলেন, "ইহুদিদের রক্ষাকর্তা মুসা বললেন, 'মিশরে এভাবে এত অত্যাচার সহ্য করে থাকা যাবে না । বাঁচতে হলে আমাদের পালাতে হবে ।' ব্যস, যেই কথা সেই কাজ । পাহারাদার সেনাদের ফাঁকি দিয়ে তারা দলে-দলে মিশর রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে এল । এতক্ষণ, বুঝলে, তাদের কোনও অসুবিধে হয়নি । কিন্তু আর যে এগিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না । সামনে বিরাট বাধা ।"

"বাধা ? কিসের বাধা দাদু ?" ওরা উসখুস করে ।

"আরে, সে-কথাই বলছি তোমাদের । শোনো না । রেড সি মানে লোহিত সাগরের সামনে এবার তারা এসে পড়েছে । পার হবে কী করে ? সকলের মনেই ভীষণ চিন্তা ।"

"কেন ?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করে অনু, "রামচন্দ্রের মতো সেতু বাঁধবে ।"

"আরে বোকা মেয়ে, অত সময় কোথায় ?" সিকদারদাদু বলেন, "আসলে কী হল বলি শোন, সকলের মনের আতঙ্ক কিন্তু দূর হয়ে গেল এক মুহূর্তেই । মুসা তাঁর হাতের লাঠি বাড়িয়ে ধরলেন । দেখতে-না-দেখতেই সাগরের জল দু' ভাগ হয়ে পায়ে হেঁটে যাওয়ার পথ করে দিল তাদের । তাঁর দলবল সবাই অন্য পারে চলে গেলে এবার মুসা তাঁর লাঠি টেনে নিলেন । রেড সি আবার ভীষণ কলরবে আগের মতোই বইতে লাগল । ওদিকে মিশরের রাজার সৈন্যরা ইহুদিদের পালিয়ে যাওয়ার খবর পেয়ে তাড়া করেছিল । ওই রাস্তা দিয়ে তারা চলেও আসছিল । কিন্তু রেড সি-র সেই পথ তখন তো বিপুল জলরাশিতে ভরে গিয়েছে । তাই তারা সবাই ডুবে মারা গেল ।"

গল্পটা এ-পর্যন্ত বলা হয়েছে কি হয়নি, মাম্পু আর টুকু হইচই করে উঠল, "না দাদু, না । মোসেজের ঘটনাটা এরকম নয় ।"

"তবে ? তবে কেমন ?" ওদের আচমকা আক্রমণে হকচকিয়ে যান সিকদারসাহেব । "কী ব্যাপার ? বলো তো শুনি ।"

সিকদারদাদুর কথায় এবার বলা শুরু করে মণি, "আসলে ঘটনাটা ঘটেছিল একটু অন্যরকম । মোসেজ তো ইহুদিদের নিয়ে মিশর থেকে পালিয়ে রেড সি-র কাছে এসে হাজির হয়েছেন । সকলের ভাবনা, এবার কোথায় যাবে তারা ? কোন দিকে ? মোসেজ শুনলেন সেই ভয়ের কথা । কানাকানি । তিনি সঙ্গে-সঙ্গে এঞ্জিনিয়ারদের হুকুম দিলেন—একটা পণ্টুন ব্রিজ তৈরি করে দাও । কথা শেষ হওয়ার আগেই এক ভোজবাজিতে সেতু তৈরি হয়ে গেল । সবাই তাড়াতাড়ি পার হল । কিন্তু এপারে পৌঁছতে-না-পৌঁছতেই তারা দেখল মিশরের সেনারা ট্যাঙ্ক নিয়ে পেছনে-পেছনে ধাওয়া করে আসছে । বিদ্যুৎগতিতে মোসেজ তাঁর ওয়াকিটকিতে মিত্র পক্ষের হেড কোয়ার্টারে সাহায্য চেয়ে খবর পাঠালেন । আর কী ? খবর পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে বোমারু বিমান এসে ঝাঁকে-ঝাঁকে বোমা ফেলে ওই সেতু ধ্বংস করে দিল । বেঁচে গেল ইহুদিরা । পালিয়ে গেল । বুঝলে দাদু, এই হল আসল কথা । আমরা যা পড়ি তা আসলে কল্প-কাহিনী । গল্প । ওসব বাজে কথা কে বিশ্বাস করে ? তুমিই বলো না দাদু, ওরকম গল্প কি সত্যি হতে পারে ? সত্যি হয় ?"

এক প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে মণি তার কথা শেষ করে । সিকদারদাদু অনেকক্ষণ কোনও কথা বলতে পারলেন না । চুপ করে থাকলেন । শেষে বললেন, "তার মানে তোমরা আজকালকার ছেলেমেয়েরা এরকম অনেক কিছুকেই অবাস্তব গল্পগাথা বলে মনে করো । তাই না ? অলৌকিক কোনও ঘটনাকে

কেউটের খেলা

চুনীলাল রায়

তোমরা মানবেই না। মানতে চাইছই না। কী হল বলো ? তবে একটা কথা বলি তোমাদের, বুজরুকি ব্যাপার-স্যাপার আর অলৌকিক—এ দুটো কিন্তু এক নয়, জানবে।"

সিকদারসাহেব হাসেন। তারপর তাঁর গল্প শুরু করেন, "যে সময়ের কথা বলছি, সে সময় আমি ব্যান্ডেলে পোস্টেড। যা হোক, একদিন বারান্দায় বসে আছি। সকালবেলা। ছুটির দিন। বন্ধু গৌর এসেছে। তার সঙ্গে গল্পগুজব করছি।

"এমন সময় দেখি দু'জন লোক আমার বাংলোর গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকছে। দু'জনেরই বেশ গাটাগোট্টা শক্তসমর্থ পাকাপোক্ত চেহারা। যে জনের বয়স একটু বেশি, তার চুলে পাক ধরেছে। অন্যজন অল্পবয়সী। দু'জনের গায়ের রংই তামাটে। বোঝা গেল রোদে-রোদে জলে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোই এদের কাজ। তা এরই মধ্যে তারা চলে এসেছে বারান্দার কাছে। সামনে এসে হাতজোড় করে দাঁড়াল দু'জনেই। কোনওরকম ভয়ডরের চিহ্ন নেই তাদের চোখে-মুখে। যদিও তাদের চেহারা দেখে আমারই একটু ভয়-ভয় হয়েছিল। কিন্তু ওদের কাণ্ড-কারখানা দেখে আমরা তো অবাক ! বলা নেই কওয়া নেই একেবারে বাড়ির ভেতরে ? কী ভেবেছে এরা ? চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছি তখন। একটু রাগ করেই বললাম, 'কী ব্যাপার ? কি চাই ? এভাবে না বলে ভেতরে এলে কেন ?'

"এত রাগ করে বললাম। অথচ জবাব দিতে গিয়ে তারা কোনও ভণিতাই করল না। সেইরকম হাতজোড় করা অবস্থাতেই বলল, 'আমরা সাপ ধরে বেড়াই। এখানে সাপ আছে। ধরব। অনুমতি যদি দেন দয়া করে।'

"'সাপ ধরা ? আরে সাপের ব্যাপারে আমিও কিছু-কিছু জানি।' গৌর বলে, 'জানো, বইয়ে পড়েছি ঋগ্বেদের মধ্যে সাপের কোনও উল্লেখ নেই। কিন্তু যজু ও অথর্ববেদে সাপের অনেক উল্লেখ রয়েছে। পণ্ডিতদের ধারণা আর্যরা ভারতে আসার আগে সাপের সঙ্গে পরিচিতই ছিলেন না। এমনও হতে পারে তারা শীতপ্রধান কোনও দেশ থেকে এসেছিলেন। আবার যে পথ দিয়ে তাঁরা ভারতে এসেছিলেন সেসব জায়গার সাপের বিষয়ে কিছু-কিছু ধ্যানধারণা, পরিচিতিও সঙ্গে এনেছেন। অথর্ববেদে সাপের যে নাম পাওয়া যায়, তাদের সঙ্গে প্রাচীন ব্যাবিলনিয়ার কয়েকটি সাপের নামের মিল রয়েছে। অবশ্য এদেশে আগে থাকতেই ছিল সর্পপূজক দ্রাবিড় জাতি। বুঝলে, আরও অনেক অ-নে-ক কথা বলতে পারি।' অনেক কথা একসঙ্গে বলে গভীর পরিতৃপ্তি লাভ করে গৌর। তারপর ওদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে জানতে চায়, 'আগেও কি সাপ ধরে বেড়াতে ?'

"'আজ্ঞে হ্যাঁ সার। হিলিতে ইসমাইল সাহেবের এক হাজার হান্টার মানে সাপ ধরার লোক ছিল। আমরাও সেই দলে ছিলাম। আমরা সাপ ধরে বেড়াতাম। মারতাম। সেই সাপের চামড়া দেশ-বিদেশে চালান যেত। কিন্তু সাহেব মারা যাওয়ায় সে কারবার উঠে গেছে। আমরাও তাই আজ এখানে তো কাল সেখানে, এমনই করে এখানে-সেখানে ঘুরে-ঘুরে সাপ ধরি। কোনও সময়ে আবার সাপের খেলা দেখিয়ে বেড়াই। মন্ত্র পড়ি। বলি—'খা খা বক্কিলা রে খা। যে মা মনসার পূজা দেয় না, তার থানে মানত করে না, গরিব-দুখিরে মানে না, তার মুখে আগুন। খা-খা বক্কিলা রে খা। খা।' বড়জন ধীরে ধীরে খুব সমীহ করে সব কথার জবাব দেয়।

"'কিন্তু কী করে বুঝছ যে, এখানে সাপ আছে ?' আমি জিজ্ঞেস করি।

"এবার বড়জন ছোটকে কানে-কানে কী সব যেন বলে। একটা জায়গায় মাটি জমে-জমে একটু উঁচু মতো হয়েছিল। হাত দিয়ে সেই জায়গাটাই দেখিয়ে দেয়। ছোটজন এক ছুটে চলে যায় সেখানে। ওই ঢিবির একচাপ মাটি তুলে আনে হাতে করে। এবার বড়জন তার কাঁধে রাখা ঝোলা থেকে মা মনসার এক মূর্তি বের করে আনল খুব সাবধানে। মাথায় ঠেকাল মূর্তিটা। ছোটজন এরই মধ্যে বাগান থেকে দু-চারটে ফুল কুড়িয়ে এনেছে। দেখা গেল বড়জন ডান হাতে মা মনসার মূর্তি নিয়ে বিড়বিড় করে কী সব মন্ত্র যেন আওড়াচ্ছে। আর ছোটজনের আনা ওই ফুল মা মনসার পায়ে ঠেকিয়ে মাটির ওপর ফেলছে। অনেকক্ষণ পর বড়জন যেন জেগে উঠল। তখন তার সে কী চেহারা। চোখ হয়েছে লাল, সমস্ত গা-হাত-পা যেন ফুঁসছে। ভক্তিভরে মাটি তুলে নিয়ে মাথায় ঠেকাল, তারপর শুঁকল,

শেষে বলল, 'এখানে সাপ আছে।'

"এর পর সে ছোটজনকে ডেকে কী সব যেন বলল কানে-কানে। দৌড়ে গেল ছোট ঢিবির কাছে। মাটিতে এক খাবলা দিল। দেখা গেল একটা সাপ শুয়ে রয়েছে। কুঁকড়ে গেছে। এক ঝটকা মেরে সে তার লেজ ধরে তুলল সোজাভাবে। কিন্তু হয়তো ঠিকমতো হয়নি ধরা। সেই সুযোগে সাপটা এক ঝাপটা মারল। তারপর ছিটকে পালাল।

"ব্যস, সঙ্গে-সঙ্গে বড়জন খুব গালমন্দ করল ছোটকে। কেঁদে ফেলল বড়জন কথা বলতে-বলতে। বলল, 'মরবি মরবি রে, তুইও মরবি তোর দাদার মতো।'

"ওর এ-কথা শুনে আমি তো খুব উৎসাহ পেলাম। বেশ একটা রহস্য আছে বলে মনে হচ্ছে যেন। আমি তাই বললাম, 'কী ব্যাপার? এর মধ্যে কোনও গল্প-টল্প আছে নাকি? বলোই না শুনি।'

"ওদিকে বন্ধু গৌর কিন্তু চুপ করে ছিল এতক্ষণ। তার চোখে-মুখে যেন এক সন্দেহের ছায়া। আমার কথা শেষ হতে-না-হতেই সে এবার মুখ খুলল। বলল, 'আরে জানি বাবা জানি। জানো, দক্ষিণ ভারতে এখনও উইয়ের ঢিবি বা অন্য কোনও উঁচু জায়গায় গিয়ে পূজারীরা মন্ত্র বলে বলে সাপদের ডাকে। তারা জীবিত সাপের পুজোও করে থাকে। আচ্ছা বলো তো ওই জায়গাটায় ওই যে ডুমুর গাছের ওদিকে দেখছ একটা ঢিবি রয়েছে, দ্যাখো তো ওখানে কিছু আছে না কি? তোমাদের ওই মন্ত্রতন্ত্র পড়ার ভুজুং-ভাজুং ছাড়ো। দেখি তোমাদের কেরামতি কত!'

"ওদিকে চেয়ে দেখি কথা শেষ হওয়ার আগেই ওরা মাটি কাটল। কেটেই বড়জন বলল, 'এখানে সাপ আছে। তবে বোড়া সাপ—বিষ বেশি নেই। আসলে জানেন মাটিতে সাপের চলাফেরার চিহ্ন থাকে। আমরা দেখতে পাই। আর মা মনসার কৃপা হলে কোনও কাজই কঠিন নয়। জানেন বাবু, কেউটে সাপের কাছে আশেপাশে অন্য কোনও সাপ থাকে না। দু-তিন বিঘে জমি নিয়ে কেউটে সাপ ঘোরাফেরা করে, তার খাবারদাবার জোগাড় করে। ওই যে দেখছেন, ওই দূরে আপনার বাড়ির শেষ সীমানায় গোসাপ রয়েছে। ওদের কিছু করবেন না বাবু। ওরা বিষধর সাপের ডিম খেয়ে নেয়।'

"লোকটা এভাবেই তার কথা বলে চলে। বলে, 'হুজুর, মা মনসাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করবেন না। উনি রাগ করবেন। আর উনি রাগ করলে যে কী হয় তা যদি জানেন? জানেন না তো কেষ্টনগরের সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরের ঘটনা।'

"সিকদারসাহেব তো ওর কথা শুনে অবাক, 'আরে সেটা আবার কী ঘটনা? বল তো শুনি।'

"বড়জন বলে, 'সাহেব ওই কালী বাড়িতে মূর্তি দুটো। প্রথম জায়গা থেকে দ্বিতীয় জায়গায় পূজিত মূর্তি সরাবার যখন দিনক্ষণ সব ঠিক, তখন মা-র মূর্তি সরাতে গিয়ে দেখা গেল মা মনসা ফণা তুলে দাঁড়িয়ে। ওখান থেকে দেবীমূর্তি সরানো চলবে না। কর্তাব্যক্তিদের মাথায় হাত। এখন কী করা? কী করা? অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হল পুরনো মূর্তি পুরনো জায়গাতেই থাক। নতুন মূর্তি প্রতিষ্ঠা হোক নতুন জায়গায়। কেষ্টনগরের মন্দিরে গেলে দেখবেন পাশাপাশি দুই মূর্তিই পুজো পেয়ে আসছেন আজও।'"

সিকদারসাহেব তাঁর গল্প বলছিলেন," কিন্তু আমি দেখি যে এভাবে চললে তো আসল গল্পটাই মারা যাবে। আমি তাই তাড়াতাড়ি বললাম, 'এসব না হয় বুঝলাম। কিন্তু বাপু হে তুমি যে ছেলেটাকে কীসব বলছিলে সে কথার কি এই জবাব হল?'

"শুনে লোকটা জিভ কাটে। কেমন যেন একটু আনমনা হয়ে যায়। অনেকক্ষণ চুপ থাকে। তারপর একটু ধাতস্থ হয়ে বলে, 'হুজুর সে অনেকদিন আগের কথা। আমরা তখন থাকতাম কালকেপুর। ওই সোনারপুরের ওদিকে। ক্যানিং লাইনে। ও এবং ওর দাদা সাপ ধরে বেড়ায়। একবার তাল খাবে বলে তালগাছে উঠেছে ওর দাদা। ও হো, বলতে ভুলেছি, এ হল আমার ছোট ছেলে। যা বাবুদের পেন্নাম কর।' ছেলেটো দৌড়ে আসে। আমরা থাক-থাক করি। 'শুনুন তারপর কী হল? তালগাছের মাথার ওপর উঠে দ্যাখে সেখানে উঠেছে এক গেঁড়িভাঙা কেউটে।'

"'গেঁড়িভাঙা কেউটে?' আমরা অবাক হই, 'সে আবার কী?'

"'হুজুর এইসব কেউটে গেঁড়ি-গুগলি খায়। ভীষণ হিংস্র, ছায়ার ওপরই ছোবল মারে। তা আমার সে-ই ছেলে হেঁসো দিয়ে মারল এক কোপ। ব্যস, সঙ্গে-সঙ্গে সাপ দু' টুকরো। কিন্তু কেউটেকে কাটলেও তার মাথার দিকটা চলতে থাকে।'

"'বলো কী হে?' গৌর অবাক হয়ে জানতে চায়, 'যা, কী বাজে কথা বলছ?'

"'মা মনসার দিব্যি হুজুর।' লোকটা একটু জিরিয়ে নেয়। তারপর আবার ও বলা শুরু করে, 'আর বলি কি সাহেব? ছেলে তো তারপর বাড়ি ফিরে এসেছে তাল পেড়ে। কিন্তু বললে বিশ্বাস করবেন না সাহেব সেই কেউটের কাটামুণ্ডু ব্যাঙের মতো লাফাতে-লাফাতে একেবারে আমার বাড়ির দাওয়ায় এসে হাজির। শেষে ওখানেই লুটিয়ে পড়ল। বড় অলক্ষুণে ব্যাপার। বুকটা কেঁপে উঠল।'

"'তা বাবু, আমাদের সাপ ধরা পেশা। তার বিষ নেই, তার ছাল ছাড়িয়ে বিক্রি করি। এটুকুতে আমাদের ভয় পেলে পেট চলে কী করে? এই ভেবে মনকে শক্ত করি। কিন্তু কপাল!' লোকটা এবার মাথা চাপড়ায়। 'সেই সাপের সাপিনী দেখি তারপর রোজ আমার ছেলেকে ধাওয়া করে বেড়ায়। ছেলে যেখানে যায় সাপিনীও কোথা থেকে সেখানেই গিয়ে হাজির। ব্যাপার সুবিধের নয় দেখে শেষে দিলাম তাকে অন্য গাঁয়ে পাঠিয়ে। ছোট ছেলেও সঙ্গে গেল। তা এর মধ্যে আমিও যে দু-চারটে সাপ মারিনি তাও

নয়। মাছ ধরার ছিপে এক গোখরো। ছিপে গেঁথে গিয়েছিল গোখরো সাপ। পালাবার কী চেষ্টা! দিলাম তাকে শেষ করে। কিন্তু মন থেকে ভয় আর যায় না।'

"'ওদিকে ভিন-গাঁয়ে বোনের বাড়িতে দু-একদিন আমার ছেলেরা ভালই ছিল। কিন্তু তারপর?' এটুকু বলে ছোটজনের দিকে চোখের ইশারা করে সে।

"বাপের আদেশ পেয়ে ছোট ছেলে কথা শুরু করে, 'পিসির বাড়িতে ক'দিন বেশ চলছিল আমাদের। কিন্তু সেদিন সকালে ঘুম ভেঙে গেল দাদার ধাক্কায়—এই,ওঠ ওঠ। আমি বলি, 'কী হল আবার? চেয়ে দেখি দাদার চোখ-মুখ সাদা ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে। তার মুখ দিয়ে কথা বের হয় না। কোনওভাবে ঢোক গিলে বলে, 'সাপ। সে-ই সাপটা।' আমি তখন উঠে ঘরের মধ্যে ভাল করে দেখি। বলি,'না রে সাপ নেই। সাপ কোথায়? এ তোর মনের ভুল।' কিন্তু দাদার ভয় তবুও যায় না। বলে,'না ভাই সাপ আমায় তাড়া করেছে। এ-যাত্রা আমার বাঁচা নেই রে। ওই দ্যাখ, ওই দ্যাখ, ওই যে ঘুলঘুলি দিয়ে আমায় দেখে গেল।' দাদা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে বলে। ঘেমে গিয়েছে সে। আমি আর কিছু বললাম না। এ তো দাদার চোখের ভুল কেবল। মনের বিকার। অনেক কষ্টে দাদাকে শান্ত করি।'

"তা সেদিন রাতে আমি আর দাদা প্রতিদিনের মতো পাশাপাশি শুয়েছি। জানালা খোলা। বেশ ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে। তবে মশারি খুব ভাল করে বিছানার নীচে গুঁজে দিয়েছি। বলা তো যায় না। কোথা থেকে কী যে হয়ে যায়? একটু হুঁশিয়ার থাকাই ভাল।'

"'রাতে খুব ভাল ঘুম হল। কিন্তু ভোররাতে হঠাৎ এক গোঙানির আওয়াজে ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসলাম। দেখি দাদা পাশে নেই। মেঝেতে গড়াচ্ছে। মশারি উড়ছে হাওয়ায়। দাদাকে নজর করি ভাল করে। দেখি, দাদার পায়ে সাপের কামড়ের দাগ। বিষাক্ত সাপ বিষ ঢেলে দিয়েছে।'

"কথা শেষ করে ছোট ছেলে। তার বাপ হাত জোড় করে বলে, 'হুজুর, আজও বুঝতে পারি না যে, কেউটে কেন ওভাবে তার প্রতিশোধ নিল? তাই ছোটটাকে বারবার বলি,' কখনও দাদার মতো করিস না। আগে ভাল করে দেখে নে,ওর জোড় রয়েছে কি না আশেপাশে। দ্যাখ, সে তোকে নজর করল কী না!'

"থামে সে। পুরনো কথা মনে করে সে যেন খুব দুঃখ পায়। আমরাও কথা বলি না। চুপ করে থাকি। ভাবি এ-ও হয় নাকি? গৌর ফিস্‌ফিস্ করে কিছু একটা বলতে চায় আমায়। বোধ হয় লোকটা বুঝতে পারে আমাদের মনের কথা। বলে, 'সাহেব, আপনাদের যদি বিশ্বাস না হয় তবে পিয়ালি গাঁয়ে গিয়ে যে-কাউকে জিজ্ঞেস করুন, সে-ই বলে দেবে এসব কথা।'

"আমরা আর কিছু বলতে পারি না। ক'টা টাকা দিতে চাই ওদের। ওরা হাতজোড় করে, 'না হুজুর। আমরা ভিখিরি নই। খেটে খাই।'

"এই বলে ওরা চলে যায়। আমরা ওদের চলার পথের দিকে তাকিয়ে থাকি। গৌর কথা বলে আবার, 'জানো, এরকম এক প্রতিহিংসার কথা কোথায় যেন পড়েছি আমি। এক ভদ্রলোক এক সাপকে মেরেছিলেন। কিন্তু সাপটা কোনওক্রমে বেঁচে গেল। এর মধ্যে ওই ভদ্রলোক এক দুর্ঘটনায় পড়ে তাঁর এক পা হারালেন। কাঠের পা লাগাতে হল। এদিকে ওই সাপটা খুব তক্কে-তক্কে ছিল। সুযোগ পেয়ে ভদ্রলোককে দিল এক ছোবল। কিন্তু ভদ্রলোকের কপাল জোর। তাঁকে বাঁচিয়ে দিল ওই কাঠের পা। সাপটা যে তাতেই কামড় বসিয়েছিল!"

এবার সিকদারসাহেব তাঁর কথা শেষ করলেন। বললেন, "কী হল ভুতো, অনু, মণি? কিছু বলবে মাম্পু আর টুবু? জানবে, এসবও হয়। পৃথিবীর কোথায় কী ঘটছে এরকম তার কতটুকুই বা জানি আমরা বলো তো? সত্যি-মিথ্যে বিচার করার যোগ্যতা আমাদের কোথায়? প্রকৃতির সব রহস্য জেনে যাব সে ক্ষমতাই বা কতটুকু?"

ওরা কথা বলতে পারে না। সবাই চুপ করে থাকে। এ-ওর মুখের দিকে তাকায়। জবাব খুঁজে পায় না। কেমন যেন এক অস্বস্তিকর পরিবেশ। সেই গুমোট কাটাতে মাম্পুই এবার বলে বসে, "দাদু,এবার তবে অন্য গল্প হোক।"

সবাই আনন্দে ঘাড় নাড়ে। হাততালি দিয়ে ওঠে।

সিকদারসাহেবও অন্য গল্প শুরু করেন।

ছবি: কৃষ্ণেন্দু চাকী

খেলাধুলো

কারা জিতবে বিশ্বকাপ

এবারের বিশ্বকাপে বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা কোন দেশের ? প্রখ্যাত ভাষ্যকার ও বিশেষজ্ঞ নরোত্তম পুরি জানিয়েছেন তাঁর মতামত

এবারের বিশ্বকাপ ফুটবলের আকর্ষণ নিঃসন্দেহে অন্যান্যবারের চেয়ে অনেক বেশি। কোনও সন্দেহ নেই যে, এবার হবে তীব্র প্রতিযোগিতা। নির্দিষ্টভাবে কোনও দলকেই এবার ফেভারিট বলা যাচ্ছে না, যেটা অন্যান্যবার সম্ভবপর হত। এবারের বিশ্বকাপে বেশ কয়েকটি দল সমপর্যায়ের। তাই ইতালির বুকে এবার দেখা যাবে ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার দলগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিরোপা দখলের জন্য প্রচণ্ড লড়াই। ইউরোপের বুকে এর আগে অন্য কোনওবার কোনও লাতিন আমেরিকার দেশ চ্যাম্পিয়ান হতে পারেনি। প্রবল, সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ান কয়েকটি দলের কথা এখানে আলোচনা করছি।

এবারের বিশ্বকাপের ফেভারিট বলতে প্রথমেই আর্জেন্টিনার নাম এসে যায়। কোচ বিলার্দোর আন্তরিক চেষ্টা, খেলোয়াড়দের মধ্যে সুন্দর বোঝাপড়া এবং মারাদোনার জন্য নিঃসন্দেহে আর্জেন্টিনা অন্যান্যদের তুলনায় কিছুটা এগিয়ে, মারাদোনা ছাড়াও গত বিশ্বকাপের ছ'-সাতজন ফুটবলার এবারও রয়েছে, ফলে সহযোগী যোদ্ধাদের সাহায্যে মারাদোনার আর্জেন্টিনা এবার ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবেই এবং সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ানের খেতাব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য।

মারাদোনা এখনও একাই একশো

ব্রাজিলের দুঙ্গা

লাতিন আমেরিকার দেশগুলির মধ্যে ব্রাজিল নিঃসন্দেহে বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম দাবিদার। আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলে ফুটবলপ্রেমীদের মন জয় করা ছাড়াও ব্রাজিলই একমাত্র দেশ যারা প্রতিবার বিশ্বকাপে খেলেছে, সর্বোপরি তাদের খেলায় রয়েছে শিল্প ও সৌন্দর্যের সমন্বয়। কারেকা, রোমারিও ও বেবেটোর সমন্বয়ে গঠিত ব্রাজিলের ফরোয়ার্ড লাইন এই মুহূর্তে পৃথিবীর সেরা।

ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে অন্যতম ফেভারিট দল এবার হল্যাণ্ড। হল্যাণ্ডেই রয়েছে গুলিটের মতো টোটাল ফুটবলার ও এই মুহূর্তে বিশ্বের এক নম্বর স্ট্রাইকার বাস্তেন, রাইকার্ডের সহযোগিতায় এই তিন জনের জুটি বিশ্বের যে-কোনও দলের রক্ষণব্যূহ সহজেই ভেদ করার ক্ষমতা রাখেন। তাই ক্রুয়েফের হল্যাণ্ড যা পারেনি, গুলিটের হল্যাণ্ড তা পারবে বলে আশা করা যায়।

গোপন শক্তির অধিকারী পশ্চিম জার্মানি দলকে নিয়ে খুব বেশি হইচই না হলেও বেকেনবাওয়ারের জার্মানি এবারও বিশ্বকাপ জয়ের ক্ষমতা রাখে, সাম্প্রতিক দলকে বিশ্বকাপে তারাই সবচেয়ে ভাল পারফরম্যান্স দেখিয়েছে, ১৯৭৪ সালে বিশ্বকাপে জেতা ছাড়াও, দু'বার ফাইনাল ও সেমি ফাইনালে উঠেছে, এ ছাড়া তাদের দলে রয়েছে রুডি ভয়লারের মতো বিপজ্জনক স্ট্রাইকার, লোথার ম্যাথাউসের মতো গতিসম্পন্ন মিডফিল্ডার, ক্লাউস আরগেন থ্যালারের মতো সুইপার, যাঁরা যে-কোনও কঠিন পরিস্থিতি থেকে দলকে সাফল্যের দিকে অনায়াসে নিয়ে যেতে পারেন।

আমার মনে হয় এবারের বিশ্বকাপের সেমি ফাইনাল লাইন-আপ আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, হল্যাণ্ড ও পশ্চিম জার্মানিকে নিয়েই হবে। এবারের বিশ্বকাপ ফুটবলের আসরে নায়ক হওয়ার সম্ভাবনা যাঁর সবচেয়ে বেশি তিনি আর কেউ নন, মারাদোনা। সুস্থ থাকলে মারাদোনার কাছ থেকেই সবচেয়ে বেশি পাওয়া যাবে উন্নতমানের ফুটবল শিল্প। সম্পূর্ণ সুস্থ থাকলে ১৯৯০-এর বিশ্বকাপ চিহ্নিত হতে পারে রুড গুলিটের নামে, গুলিটই এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরা টোটাল ফুটবলার, প্রচণ্ড পরিশ্রম করার ক্ষমতা, নিজের ডিফেন্স সামলে বিপক্ষ দলের ডিফেন্স ভাঙতে তাঁর জুড়ি নেই।

আর যাঁকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত মাতামাতি হতে পারে তিনি হলেন ব্রাজিলের কারেকা। দুর্দান্ত গতিসম্পন্ন এই ফরওয়ার্ডটি পেনাল্টি বক্সের

ইংল্যান্ডকে কেউ বিজয়ী বলে ধরছে না। এই দলের অধিনায়ক ব্রায়ান রবসন যদি খেলেন, তা হলে দলকে তিনি অনেকদূর টেনে নিয়ে যেতে পারবেন।

মারাদোনার পাশে থাকবেন ভালদানো ফোটো : অমিয় তরফদার

মধ্যে ভয়ঙ্কর গোল করার দক্ষতায় তিনি নিপুণ। কারেকার চাতুর্য যে-কোনও ডিফেন্সে ফাটল ধরাতে পারে।

তবে প্রতিবারই বিশ্বকাপে অঘটন ঘটে, এবার এই সম্ভাবনা আরও প্রবল। আমার মনে হয় অঘটন ঘটাবার ক্ষেত্রে প্রথম দিকের তালিকায় আছে স্পেন দুর্দান্ত মিডফিল্ড ও ফরওয়ার্ডদের সাহায্যে স্পেন যে-কোনও দলকে হারাবার ক্ষমতা রাখে। স্পেনীয় কোচের ভাষায় বর্তমান বিশ্বের অন্যতম সেরা মিডফিল্ডারদের মধ্যে মিশেল ও ফরওয়ার্ডদের মধ্যে বুত্রাগেনো অন্যতম। তবে এই ক্ষেত্রে আমেরিকাকেও বাদ দেওয়া যায় না। ২৪ বছর পরে এইবার তারা বিশ্বকাপে খেলছে এবং গ্রুপের ও কোয়ালিফাইং রাউণ্ডের প্রতিটি খেলায় তারা উন্নত মানের ফুটবল খেলেছে কাজেই শক্তির তুল্যমূল্য বিচারে আমেরিকা খুব একটা পিছিয়ে নেই।

সবশেষে আয়োজক দেশ ইতালির কথা। নিজেদের মাঠ, দর্শক এবং প্রচণ্ড লড়াকু মানসিকতার সাহায্যে ইতালি যে-কোনও দুরূহ কাজ সহজ করে তুলতে পারে। ইতালির ডিফেন্স সর্বদাই সেরা, তাই রক্ষণব্যূহ ভেদ করে গোল করা নিশ্চয়ই যে-কোনও দেশের পক্ষে কঠিন। সর্বোপরি এবার ইতালি দলে রয়েছেন এমন কিছু প্রতিভাশালী খেলোয়াড়, যাঁরা দলকে বিশ্বকাপ জেতাতে সক্ষম। তাই আমার মনে হয় ইতালিতে এবার দেখা যাবে দশকের সেরা লড়াই, আমরা সেই প্রতীক্ষাতেই আছি।

অনুলিখন : সুজন ঠাকুরতা

রুডি ভয়লার
ফোটো : নিউজমেন ফিচার্স

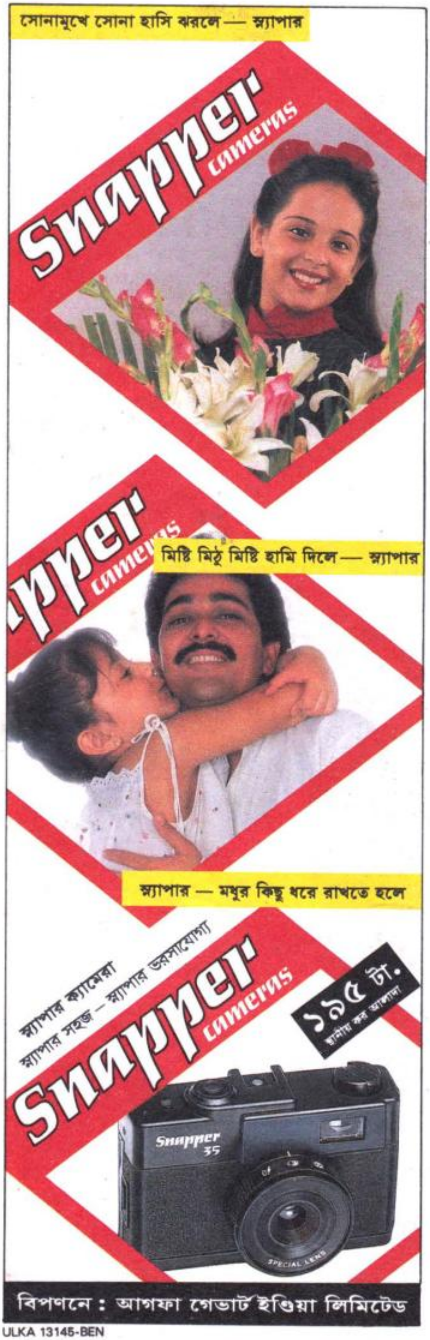

ULKA 13145-BEN

কী হবে রণকৌশল!

ফুটবলে এখন বড় কথা ট্যাকটিক্স। খেলার মাঠে সঠিক নীতি ও কৌশলই জয়ী হয়।
লিখেছেন **স্বপ্নাতীত সরকার**

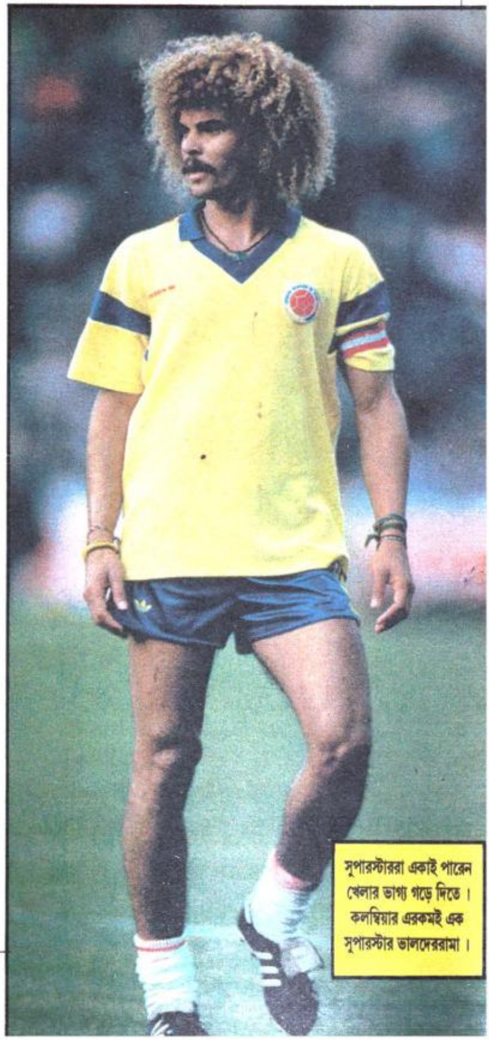

সুপারস্টাররা একাই পারেন খেলার ভাগ্য গড়ে দিতে। কলম্বিয়ার এরকমই এক সুপারস্টার ভালদেররামা।

এ যেন যুদ্ধক্ষেত্র ! যুদ্ধে যেমন বিভিন্ন কৌশল, এখানেও তাই । যেভাবেই হোক বিপক্ষকে হারাতে হবে । তার জন্য বিভিন্ন দলের বিভিন্ন নীতি । চতুর্দশ বিশ্বকাপের বিভিন্ন দলের কৌশলগুলো এখনও স্পষ্ট নয় । বলা যায় যে, ১৯৮৬ সালের মতোই এই বিশ্বকাপ তারকাদের কাপ হবে । যেখানে শিল্পীরা তুলে ধরবেন তাঁদের শিল্প । আমরা পাব মারাদোনা, কারেকা, বুত্রাগেনো, লিনেকারের মতো শিল্পীদের । কারণ ১৯৯০ সালের বিশ্বকাপের, ফিফার নির্দেশিত মূল নীতি, "গো ফর গোল", অর্থাৎ গোল করতে দাও, খেলতে দাও তাদের, যাদের জন্য উন্মুখ বিশ্বের কোটি-কোটি মানুষ ।

১৩টি বিশ্বকাপে এখন অবধি সবচেয়ে বেশিবার জিতেছে লাতিন আমেরিকা (৭ বার জিতেছে) ও ইউরোপীয়রা (৬ বার জিতেছে) । চর্তুদশ বিশ্বকাপে ইতালিতে কৌশলে কে কাকে হারায় সেটাই দেখার বিষয় । ইউরোপীয়দের শক্তিময় ফুটবল, না লাতিন আমেরিকার শিল্প ! তা ছাড়াও আছে এশিয়া ও আফ্রিকার উদ্দীপক খেলা । কিন্তু কী হবে এদের কৌশল ?

এবার লাজারোনির ব্রাজিল খেলবে নিজেদের কিছুটা গুটিয়ে, ৩-৫-২ ধারায় । কিন্তু মাঝমাঠে তাদের থাকবে বেশি লোক, কখনও বা ৪-৫-১ ছকে খেলবে তারা । জিততে চায় ব্রাজিল, ভুলতে চায় আগের চার বিশ্বকাপের স্মৃতি ।

কাইজার বেকেনবাওয়ারের পশ্চিম জার্মানি চায় প্রকৃত ইউরোপীয় ধারায় খেলতে । তারা হয়তো খেলবে ১-৩-৫-২ ছকে, কারণ কাইজার মনে করেন গোলকিপার ছাড়া সবাই মাঠে ব্যস্ত থাকলে কিছু-না-কিছু ঘটবেই ।

কার্লোস বিলার্দোর আর্জেন্টিনা ব্যক্তিগত দক্ষতায় বিশ্বাসী, ভিসিনির ইতালি এবার আক্রমণাত্মক খেলবে ।

হল্যান্ড খেলবে প্রধানত দুই উইং দিয়ে । লুই সুয়ারেজের স্পেন যাবে আক্রমণে, ববি রবসনের ইংল্যান্ডও তাই । যোসেফ ভ্যানগ্লসের চেকোস্লোভাকিয়া খেলবে মাঝমাঠে লোক বাড়িয়ে, ১-২-৫-২ ধারায় । ট্যাবরোজের উরুগুয়ে ও গাই থাসের বেলজিয়াম নির্ভরশীল ব্যক্তিগত দক্ষতার ওপর । ভেলেরি লোবোনোভস্কির রাশিয়া নির্ভরশীল তাদের মাঝমাঠের ওপর । মার্ভিন রড্রিগেজের কোস্টা রিকা খেলবে ৪-৪-২ প্রথায় । তাদের চারজন থাকবে মাঝমাঠে । মহম্মদ আল গোহারির মিশর খেলবে এক নতুন ধারায় । লি হোক তেকের দক্ষিণ কোরিয়ার খেলার নীতি যথাসম্ভব বলের কাছাকাছি খেলোয়াড় বাড়ানো ।

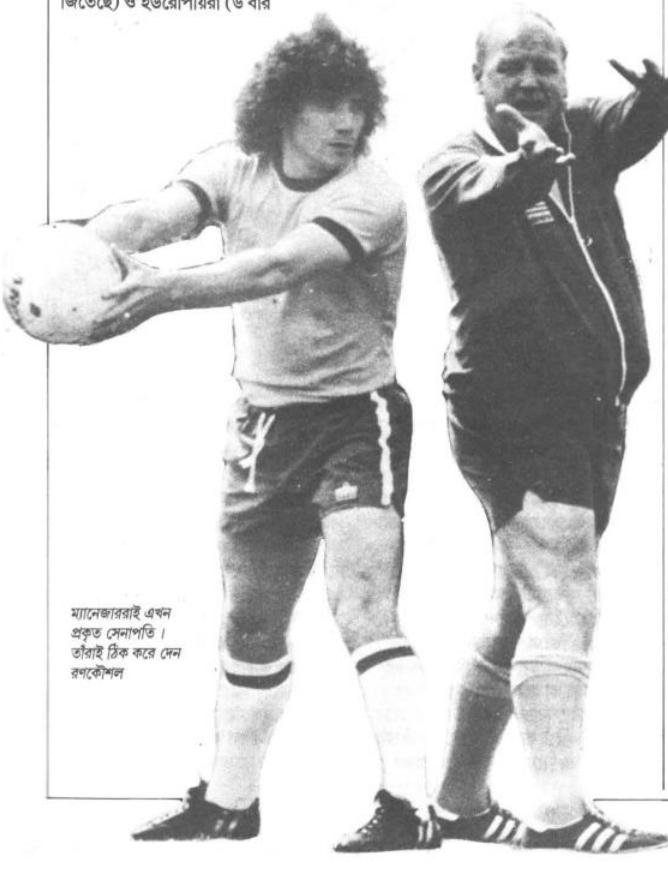

ম্যানেজাররাই এখন প্রকৃত সেনাপতি । তাঁরাই ঠিক করে দেন রণকৌশল

যোসেফ হিকার্সবার্গারের অস্ট্রিয়া খেলবে ১-৩-৫-২ প্রথায় । 'বোল্ট' বা 'ক্যাটানাসিও' চালে । জ্যাকি চার্লটনের আয়ারল্যান্ড, এমেরিখ জেনেইয়ের রুমানিয়া, ওলে নর্ডিনের সুইডেন ও আইভিরা ওসিমের যুগোস্লাভিয়ার লক্ষ কোনও অঘটন ঘটানো । অ্যান্ডি রক্সবার্গের স্কটল্যান্ডের নীতি বেশি গোল করা ।

এ তো গেল কৌশল ও নীতির কথা, কিন্তু প্রথার বাইরে বেরিয়ে তারকা হতে পারবেন ক'জন ? কারণ সবাই জানেন খেলোয়াড়দের জন্য প্রথা, প্রথার জন্য খেলোয়াড় নয় । আশা করা যায় যে, রোমারিও, বেবেটো, দুঙ্গা, রাইকার্ড, ক্যানিগ্গিয়া, বার্নস,হ্যাসলার, প্রত্যাসভ, হাগ্গি, ডেমোল, ভ্যাসকুয়েজ, মোরান, হমিদ,কিম জো সুন, জন হক্স, ভিয়াল্লি, হারজাগ, ভালদেররামা, রড্রিগজ , লিবি, বিলেক-দের মধ্যে থেকে যে-কেউ চমকে দেবেন বিশ্বকে । হয়ে উঠবেন নক্ষত্র । ভেঙে দেবেন প্রথার বেড়াজাল, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠা করবেন নিজেকে ।

১৯৮৬ সালে মেক্সিকোতে প্রায় সব ক'টি দলই খেলেছে ২ বা ৩ ফরওয়ার্ড নিয়ে, কিন্তু বাড়িয়েছে তাদের মাঝমাঠের খেলোয়াড় । ফ্রান্স তো চারজন মাঝমাঠের খেলোয়াড়কেও খেলিয়েছে এক সময় । কিন্তু সবাই গেছে ওপেন অ্যাটাকে । চেষ্টা করছে গোলের ।

এবারে ১৯৯০-এর বিশ্বকাপে বিভিন্ন দলের কৌশল বিভিন্ন, কিন্তু একটা জিনিস স্পষ্ট । তা হল বেশিসংখ্যক গোল করা ।

আগ্নেয়গিরির ওপর বসে আছেন ম্যানেজাররা

দল জিতলে কোচ বা ম্যানেজাররা পান দারুণ সম্মান। দল হারলে তাঁরাই হন ক্রোধের শিকার। লিখেছেন **মানস চক্রবর্তী**

ফুটবল এখন আর এগারোজনের খেলা নয়। আসলে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে বারোজনের। মাঠে খেলেন এগারোজন। যিনি বাইরে থাকেন, তাঁর ভূমিকাও বিরাট। নব্বই মিনিটের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি মুভমেন্টের ওপর তাঁকে নজর রাখতে হয়। তাঁর একটি সিদ্ধান্তই ম্যাচের ভাগ্য বদলে দিতে পারে। পুরো দলটিকে অদৃশ্য সুতোয় যিনি নাচাবার ক্ষমতা রাখেন, পুরো দলটি যাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে তিনি হলেন দলের ম্যানেজার। ফুটবলের ইতিহাসের গোড়ার দিকে কোচ বা ম্যানেজারের ভূমিকা বা গুরুত্ব সেভাবে বোঝা না গেলেও যত দিন যাচ্ছে ততই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছেন ম্যানেজাররা। ১৯৮৬-র বিশ্বকাপ জিতল আর্জেন্টিনা। সারা বিশ্ব মাতালেন দিয়েগো মারাদোনা। একবারের জন্যও মাঠের মধ্যে নামেননি কার্লোস বিলার্দো। কিন্তু আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ে তাঁর ভূমিকাও কি কম? অনেকে তো মনে করেন মারাদোনার চেয়েও বেশি। আহত মারাদোনাকে মানসিক ও শারীরিকভাবে সুস্থ করে এবং আরও দশজন সাধারণ মানের ফুটবলার নিয়ে বিলার্দো যেভাবে বিশ্বকাপ উপহার দিয়েছিলেন তাঁর দেশকে, তা আজ ইতিহাস। ফাইনালে তিনি পাঁচজন মিডফিল্ডার নামিয়েছিলেন জার্মানদের মাঝমাঠের আধিপত্য খর্ব করার জন্য। তাঁর এই স্ট্রাটেজি কাজে লেগেছিল। পর পর দুটো গোল খেয়েও চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল আর্জেন্টিনা। মারাদোনা সেদিন গোল করতে পারেননি। তাঁর পেছনে বেকেনবাওয়ার লাগিয়েছিলেন তাঁর অন্যতম সেরা ফুটবলার লোথার ম্যাথাউসকে। সেটা বুঝে বিরতির পর বিলার্দো নির্দেশ দিলেন মারাদোনাকে নেমে খেলতে। এবং নীচ থেকেই মারাদোনার চমৎকার থ্রু পাসে গোল করে দলকে জেতালেন বুরুচাগা। বিলার্দোর ধ্যানজ্ঞান কিন্তু ফুটবল। পেশায় ম্যানেজার হলেও তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার।

ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার ও তাঁর সহকারী বার্তি ভোট্‌স। বেকেনবাওয়ারের পর ভোট্‌স হবেন পঃ জার্মানির দলের ম্যানেজার

গবেষণামূলক কাজকর্মও প্রচুর করেছেন। যৌবনে চুটিয়ে ফুটবল খেলেছেন। জাতীয় দলের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে ফুটবল ছাড়া আর কিছু ভাবতে রাজি নন। খাবার টেবিলে বসে মাছের কাঁটা কিংবা মাংসের হাড় দিয়ে প্রতিপক্ষ ডিফেন্স সাজিয়ে তা কী করে ভাঙা যায় তা আলোচনা করেছেন মারাদোনা এবং তাঁর সতীর্থদের সঙ্গে। নাটক দেখতে গিয়েও স্বস্তি নেই ফুটবলারদের। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা মঞ্চের ওপর সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছেন। তা দেখে পাশে-বসা মারাদোনাকে জিজ্ঞেস করছেন ফ্রিকিক নেওয়ার সময় প্রতিপক্ষ ডিফেন্স যদি এভাবে প্রাচীর তোলে তা হলে কীভাবে গোল করবে? মারাদোনাদের ইতস্তত করতে দেখে হল ছেড়ে বেরিয়ে যান এবং হোটেলে ফিরেই খেলোয়াড়দের নিয়ে বসে যান আলোচনায়। এহেন ম্যানেজারকে কি দলের সাফল্যের বাইরে রাখা সম্ভব? ১৯৮৪-তে দেশের দায়িত্ব পেয়েছেন বিলার্দো। এবারের বিশ্বকাপই তাঁর শেষ। বিদায়ের আগে সাফল্যের স্বাদ পাওয়ার জন্য তিনি যে মরিয়া হয়ে উঠবেন এ তো বলাই বাহুল্য।

ঠিক একই পরিস্থিতি পশ্চিম জার্মানি দলের ম্যানেজার ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ারের সামনে। দুনিয়া-কাঁপানো ফুটবলার বলতে যা বোঝায় 'কাইজার' বেকেনবাওয়ার তাই ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে পশ্চিম জার্মানি দল ১৯৭৪-এর বিশ্বকাপ জিতেছিল। জিতেছিল ইউরোপিয়ান কাপ। এহেন বেকেনবাওয়ারকে যখন জার্মানি দলের দায়িত্ব দেওয়া হল তখন সমালোচনার ঝড় বয়ে গিয়েছিল। বলা হয়েছিল কোচিং ডিগ্রি নেই, নেই বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা, এই কোচ কি পারবেন তারকাখচিত জার্মান দলকে চালনা করতে। শুধু ভালভাবে চালনাই করেননি বেকেনবাওয়ার, ১৯৮২-র বার্সিলোনা বিশ্বকাপের মতো ১৯৮৬-তেও পশ্চিম জার্মানি দল ফাইনালে উঠল। এবং অল্পের জন্য তারা চ্যাম্পিয়ান হতে পারল না।

প্রশংসিত হলেন বেকেনবাওয়ার। কিন্তু দু' বছর পর ইউরোপিয়ান কাপে বেকেনবাওয়ারের দল আবার খারাপ খেলল। গেল-গেল রব উঠল দেশে। বলা হল, ম্যানেজার বদল না করলে কোনও আশা নেই। পশ্চিম জার্মানির ফুটবল পরিচালকরা অবশ্য আস্থা রাখলেন তাঁর ওপর। ভালয়-ভালয় দলকে মূলপর্বে তুললেন বেকেনবাওয়ার। এবং ঘোষণা করলেন এটাই শেষ। বিশ্বকাপের পরেই বিদায়। কিন্তু তাতে কি রেহাই পাওয়া যাবে দল যদি খারাপ খেলে ? মনে হয়,না। বিলার্দোর মতো বেকেনবাওয়ারও দাঁড়িয়ে আছেন ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে। পালাবার পথ নেই।

ব্রাজিলের কোচ সেবাস্তিও লাজারোনির অবস্থা আরও খারাপ। খুব বড় মাপের ফুটবলার ছিলেন না লাজারোনি। ক্লাব-ফুটবলে ছিলেন গোলকিপার। কিন্তু সফল হয়েছেন ক্লাব-কোচিংয়ে। তাঁরই প্রশিক্ষণে ফ্লেমেঙ্গো কিংবা ভাস্কো বহুবার চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। সাদাসিধে, কম কথার মানুষ লাজারোনি। নিজেকে পরিচয় দেন 'তাত্ত্বিক ও মনোবিদ' হিসেবে। লাজারোনির মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে গোটা ব্রাজিলই শুধু নয়, সারা বিশ্ব। ১৯৭০-এর পর ব্রাজিল যে শুধু চ্যাম্পিয়ানই হতে পারেনি তাই নয়, ফাইনালেও যেতে পারেনি। টেলে সান্তানারা যা পারেননি লাজারোনি কি তা পারবেন ? তবে ইতিমধ্যেই কিন্তু তিনি ভাল ফুটবলের প্রতিশ্রুতি রেখেছেন। সাউথ আমেরিকান কাপ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ব্রাজিল। লাজারোনিই চালু করেছেন ইউরোপীয় ফুটবলের মতো সুইপার সিস্টেম। ব্রাজিলিয়ান অ্যাটাক-এর মতোই শক্তিশালী হয়েছে ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্স। প্রত্যাশা পূরণ করতে পারলে রূপকথার চরিত্র হয়ে উঠবেন লাজারোনি, না হলে তাঁকেও যেতে হবে নির্বাসনে, যা তাঁর পূর্বসূরিদের ক্ষেত্রে হয়েছে।

ইতালির ম্যানেজার অ্যাজেগলিও ভিসিনি এই ভয়টাই পাচ্ছেন। সারা বিশ্বের ফুটবল প্রবক্তাদের মতে, এবারের চ্যাম্পিয়ানশিপের বড় দাবিদার ইতালি। ১৯৮২-র বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান ইতালির কোচ ছিলেন এঙো বিয়ারজোত। '৮৬-র বিশ্বকাপ পর্যন্ত বিয়ারজোতই ছিলেন দলের দায়িত্বে। মেক্সিকোয় খারাপ খেলল ইতালি। চাকরি গেল বিয়ারজোতের। খুঁজেপেতে নিয়ে আসা হল ভিসিনিকে। তাঁর ওপর ইতালির প্রত্যাশা অনেক। তিনি যাতে তাঁর কাজ সুষ্ঠুভাবে চালাতে পারেন তার জন্য তাঁকে আরও চার বছর রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু আকাশ-ছোঁয়া প্রত্যাশা যদি মাটিতে আছড়ে পড়ে, তবে ভিসিনি কি রক্ষা পাবেন ? মনে হয়, না। সবার আগে কোপটা পড়বে তাঁর ওপর। যেমন হল্যান্ডের দাই লিব্রেগ্টস। যাঁর কাছ থেকে তিনি দায়িত্ব পেয়েছেন সেই রিনেত মিশেল-এর আমলে হল্যান্ড যে স্বপ্নের ফুটবল খেলেছিল তা যদি দর্শকরা দেখতে না পায় তা হলে তুলকালাম হতে পারে। দাই-এর সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করছে রুড

অস্ট্রিয়া দলের ম্যানেজার যোসেফ হিকার্সবার্গার। ইনি জানেন, বিশ্বকাপে ছোটখাটো দলও অঘটন ঘটাতে পারে। ইনি প্রতিপক্ষের খেলার কৌশল অনুযায়ী পালটা কৌশল নিয়ে থাকেন।

গুলিটের ওপর। গুলিট যদি ফিট থাকেন, তাঁর সঙ্গে যদি ভালমতো বোঝাপড়া গড়ে ওঠে বাস্তেনের, তবেই হল্যান্ড দাঁড়িয়ে যাবে, না হলে নয়। আর তা যদি না হয় দোষ পড়বে কোচের ওপর। দাই এখন মহাসংকটে। ইংল্যান্ডের ম্যানেজার ববি রবসনের কিন্তু এ সমস্যা নেই। দল ভাল খেলুক কিংবা না খেলুক, তাঁর চাকরি থাকছেই। গত বিশ্বকাপে প্রথম দিকে জঘন্য খেললেও পরে লিনেকারের সৌজন্যে ইংল্যান্ড কোয়ার্টারি ফাইনাল পর্যন্ত গিয়েছিল। টিকে গেলেন ববি। তারপর ইউরোপিয়ান কাপে ববির দল খারাপ খেলল। তবু ববির আসন টলল না। এবারও যে তিনি বহাল তবিয়তে রয়েছেন তা তো দেখাই যাচ্ছে। তবে সবার ভাগ্য তো আর ববির মতো নয়। যেমন জ্যাকি চার্লটন। ১৯৬৬-র বিশ্বকাপ-জয়ী ইংল্যান্ড দলের সদস্য। এখন আয়ারল্যান্ডের কোচ। তাঁর কোচিংয়েই আয়ারল্যান্ড প্রথম বিশ্বকাপ খেলার যোগ্যতা অর্জন করল। এখন আয়ারল্যান্ড আরও ভাল ফল করার স্বপ্ন দেখছে। খারাপ করলে 'হিরো' জ্যাকি কিন্তু 'জিরো'তে পরিণত হবেন। এটা জানেন বলেই চেকোস্লোভাকিয়ার কোচ প্রোফেসর যোসেফ ভেনগ্লস কিংবা স্কটল্যান্ডের ম্যানেজার, স্কুল-শিক্ষক অ্যান্ডি রক্সবার্গ দলের সাফল্যের ব্যাপারে কোনও মন্তব্যে নারাজ। ঠিক উলটো রুমানিয়ার ম্যানেজার এমেরিক জেনেই। সেনাবাহিনীর প্রাক্তন কর্নেল জেনেই আগেভাগেই জানিয়ে দিয়েছেন বিরাট

সুইডেন ১৯৮৬-তে ব্যর্থ হওয়ার পর ম্যানেজারের দায়িত্ব নিয়েছেন ওলে নর্ডিন। দলে তিনি ফিরিয়ে এনেছেন আত্মবিশ্বাস। নর্ডিনেরও এবার কঠিন পরীক্ষা।

কিছু প্রত্যাশা করবেন না। হতাশ হতে হবে তা হলে। দুই রুশ কোচের আবার সমস্যা দু'রকম। সোভিয়েত ইউনিয়নের কোচ ভ্যালেরি লোবোনোভস্কি চান তাঁর দল গতবারের চেয়ে আরও ভাল খেলুক। আবার ক্যামেরুনের কোচ ভ্যালেরি নেপোমিনিয়াচির দুশ্চিন্তা প্রথম রাউন্ডের গণ্ডি পেরোনো নিয়ে। প্রাথমিক পর্বেই সোভিয়েত ইউনিয়ন আর ক্যামেরুন মুখোমুখি হচ্ছে। লড়াই কিন্তু দুই রুশ ম্যানেজারের মধ্যেও। প্রকাশ্যে না হলেও এরকম লড়াই দুই ব্রাজিলিয়ানের মধ্যেও। মারিও জাগালো সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে মূলপর্বে তুলেছেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে মতের অমিল হওয়ায় তাঁর বদলে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আর-এক ব্রাজিলিয়ান কার্লোস আলবার্তোকে। শুধু বিশ্বকাপের লড়াই তো নয়, আলবার্তোর লড়াই জাগালোর সঙ্গেও। সব মিলিয়ে ফুটবলাররা নয়, আগ্নেয়গিরির ওপরে বসে আছেন কিন্তু ম্যানেজাররাই।

আগের তেরোটি বিশ্বকাপ

শুরু হয়ে গিয়েছে চতুর্দশ বিশ্বকাপের মূল পর্বের খেলা। এই প্রসঙ্গে আগের তেরোটি বিশ্বকাপের কিছু খোঁজখবর দিচ্ছেন **অরূপ বসু**

ফেডারেশন ইন্টারন্যাশনাল দ্য ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনকে সংক্ষেপে বলা হয় ফিফা। প্যারিসে ১৯০৪ সালের ২১মে ফিফার জন্ম। ফিফার দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট জুলে রিমের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় শুরু হয় বিশ্বকাপ ফুটবল। তাঁর নামেই কাপটির নাম রাখা হয়েছিল জুলে রিমে কাপ। তিনবার জিতে কাপটি চিরদিনের জন্য পেয়েছিল ব্রাজিল। এখন বিজয়ী দেশকে যে-কাপটি দেওয়া হয় তার নাম ফিফা কাপ। ২০৪২ সালে সতেরোটি বিশ্বকাপ খেলার পর এই কাপ বদলে দেওয়া হবে। এখন আগের তেরোটি বিশ্বকাপের কথা কিছু জানানো যাক।

প্রথম বিশ্বকাপ : ১৯৩০

উরুগুয়ের মন্টিভিডিওতে প্রথম বিশ্বকাপে মাত্র ১৩টি দেশ যোগ দেয়। দেশগুলি হল : আর্জেন্টিনা, চিলি, মেক্সিকো, উরুগুয়ে, ব্রাজিল, বলিভিয়া, প্যারাগুয়ে, পেরু, ফ্রান্স, যুগোস্লাভিয়া, রুমানিয়া, বেলজিয়াম ও আমেরিকা। ৩০ জুলাই, বুধবার সেন্টিনারিও স্টেডিয়ামে ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে রিভার প্লেট নদীর দু'পারের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ উরুগুয়ে ও আর্জেন্টিনা। উরুগুয়ে জেতে ৪-২ গোলে। উরুগুয়ের হয়ে গোল দিয়েছিলেন দোরাদো, পেদ্রো সিয়া, ইরিয়ার্ত ও কাস্ত্রো, আর্জেন্টিনার গোল করেন পিউসেল ও স্টেবাইল। প্রথম বিশ্বকাপ জয়ের জন্য পরের দিন উরুগুয়েতে জাতীয় ছুটি ঘোষিত হয়।

বিশ্বকাপের উল্লেখ্য ঘটনা : প্রথম ম্যাচেই ফ্রান্সের গোলরক্ষক আহত হলে তাঁর স্থান নেন হাফব্যাক। তখন বদলি খেলোয়াড়ের নিয়ম ছিল না। ফ্রান্স-আর্জেন্টিনা ম্যাচে রেফারি ভুলক্রমে প্রথমে ছ' মিনিট কম খেলান। আর্জেন্টিনা-মেক্সিকো ম্যাচে ন'টি গোল হয়, তার মধ্যে পাঁচটি পেনাল্টি থেকে।

দ্বিতীয় বিশ্বকাপ : ১৯৩৪

মুসোলিনির ইতালিতে বসেছিল বিশ্বকাপের দ্বিতীয় আসর। দলের সংখ্যা বেড়ে হল ১৬। মুসোলিনির ইচ্ছে ছিল, যেভাবে হোক বিশ্বকাপ জিততে হবে। ১০ জুন, রোম স্টেডিয়ামে তাই হল, ইতালি ২-১ গোলে হারাল

চেকোস্লোভাকিয়াকে। গোল করলেন ইতালির পক্ষে অর্সি ও শিয়াভিও। চেক দলের গোলটি দেন পাচ। খেলাটি অবশ্য অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত গড়ায়। অর্সি যে গোলটি করেন, পরের দিন তিনি কুড়িবার চেষ্টা করেও ওরকম শট নিতে পারেননি। বিশ্বকাপের প্রথম পেনাল্টি নষ্ট করলেন ব্রাজিলের ডি ব্রিটো, স্পেনের বিপক্ষে। ইনিই ছিলেন পেলের কোচ। মন্তি হলেন প্রথম ফুটবলার যিনি দুটি দেশের হয়ে বিশ্বকাপ খেলেছেন। ১৯৩০-এ আর্জেন্টিনার হয়ে, এবারে ইতালির পক্ষে।

১৯৩৪-এর ফাইনাল। ইতালির ম্যানেজার ভিত্তোরিও পোজো (বাঁ দিকে) নির্দেশ দিচ্ছেন তাঁর খেলোয়াড়দের

তৃতীয় বিশ্বকাপ : ১৯৩৮

এবার প্যারিস। ফাইনালে উঠল গতবারের বিজয়ী ইতালি এবং অন্যদিক থেকে হাঙ্গারি। স্টেডিও কলম্বেতে হাঙ্গারি পেল প্রবল জনসমর্থন। কিন্তু ইতালিকে রোখা গেল না। ৪-২ গোলে জিতল তারা। ইতালির পক্ষে গোলদাতা : কোলাউসি (২), পিয়োলো (২)। হাঙ্গারির পক্ষে টিটকোস ও সারোসি।

চতুর্থ বিশ্বকাপ : ১৯৫০

যুদ্ধের জন্য ১২ বছর বন্ধ থাকার পর এবার আসর বসল ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরো শহরে। সেরা অঘটনটি ১৬ জুলাই দেখলেন প্রায় দু' লক্ষ দর্শক, বিশ্বের সর্ববৃহৎ মারকানা স্টেডিয়ামে বসে। ফাইনালে ফেভারিট ব্রাজিল হারল উরুগুয়ের কাছে, ১-২ গোলে। উরুগুয়ের হয়ে গোল করলেন শিয়াকিনো ও ঘিগিয়া, ব্রাজিলের ফ্রিয়াকা।

পঞ্চম বিশ্বকাপ : ১৯৫৪

আবার অঘটন। এবার ৪ জুলাই, সুইজারল্যান্ডের বার্ন-এর ওয়াংকডর্ফ স্টেডিয়ামে। চার বছর ধরে আন্তর্জাতিক ম্যাচে অপরাজিত পুসকাস, হিদেকুটি, কোজিসের হাঙ্গারি ফাইনালে হারল পশ্চিম জার্মানির কাছে, ২-৩ গোলে। গ্রুপ ম্যাচে হাঙ্গারি জার্মানদের হারায়

৮-৩ গোলে। ফাইনালে গোল দিলেন জার্মানির মরলক ও রাহ্ন (২), হাঙ্গারির পুসকাস ও জিবর। এই বিশ্বকাপে ২৬টি ম্যাচে ১৪০টি গোল হয়, গড় ৫·৩। এখন পর্যন্ত এই রেকর্ড ভাঙেনি।

ষষ্ঠ বিশ্বকাপ : ১৯৫৮

অবশেষে ব্রাজিলের দিন এল— ২৯ জুন। সুইডেনের সলনা স্টেডিয়ামে ব্রাজিল সুইডেনকে তছনছ করে জিতল তাদের প্রথম বিশ্বকাপ। এই বিশ্বকাপেই আবির্ভাব ঘটল ১৭ বছরের এক তরুণের, পরবর্তীকালের ফুটবল সম্রাট পেলে। আর ব্রাজিল কী দল! স্যান্টোস, ডিডি, গ্যারিঞ্চা, জাগালো, ভাভা— দক্ষতা ও শিল্পের এঁরাই শেষ কথা। ফাইনালে ব্রাজিলের পাঁচটি গোল দিলেন : ভাভা (২), পেলে (২), জাগালো। সুইডেনের দুটি : লিয়েডহোম, সাইমনসন।

১৯৬৬-র ফাইনাল জিওফ হার্স্ট-এর বিতর্কিত গোল

অষ্টম বিশ্বকাপ : ১৯৬৬

লন্ডনের এই বিশ্বকাপটি চিহ্নিত হয়ে আছে 'বিতর্কিত' হিসেবে। ৩০ জুলাই, ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামের ফাইনালটি উত্তেজনায় উপভোগ্য

১৯৫৮-র ফাইনালে সতেরো বছরের পেলে

সপ্তম বিশ্বকাপ : ১৯৬২

দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ পেল ব্রাজিল। চিলির সান্তিয়াগোর ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে ১৭ জুন ব্রাজিল চেকোস্লোভাকিয়াকে হারাল ৩-১ গোলে। গোল দিলেন আমারিল্ডো, জিটো, ভাভা। চেক দলের পক্ষে মাসোপোস্ট। এবারের প্রতিযোগিতা খুব একটা উঁচু পর্যায়ে ওঠেনি।

হলেও, অনেকের অভিযোগ, ইংল্যান্ড 'অন্যায্য' গোলে পশ্চিম জার্মানিকে হারায়। অভিযোগ, হার্স্টের দ্বিতীয় গোলটি নিয়ে। ইংল্যান্ড অতিরিক্ত সময়ে জেতে ৪-২ গোলে। হার্স্ট (৩) এবং পিটার্স জয়ী দলের পক্ষে এবং হলার ও ওয়েবার জার্মান দলের হয়ে গোল দেন। বিশ্বকাপ ফাইনালে প্রথম হ্যাটট্রিক করলেন হার্স্ট।

নবম বিশ্বকাপ : ১৯৭০

মেক্সিকোর অ্যাজটেক স্টেডিয়াম থেকে জুলে রিমে কাপ চিরদিনের জন্য নিয়ে গেল ব্রাজিল, তিনবার বিশ্বকাপ জয়ের সুবাদে। তারিখ ২১ জুন। তিনবার জয়ের সুযোগ ছিল ইতালিরও, কিন্তু ব্রাজিলের আক্রমণের সামনে দাঁড়াতেই পারল না তারা। ১-৪ গোলে হেরে গেল ইতালি। গোল দিলেন ব্রাজিলের পেলে, গারসন, জেহরজিনহো ও আলবার্তো। ইতালির বনিনসেগনা। নিজে একটি গোল করে ও দুটি গোল করিয়ে বিশ্বকাপকে বিদায় জানালেন সম্রাট পেলে।

দশম বিশ্বকাপ : ১৯৭৪

এই বিশ্বকাপের প্রধান উপহার 'টোটাল ফুটবল'। ফাইনালিস্ট দু' দলই এর চূড়ান্ত রূপ দেখাল। মিউনিখ স্টেডিয়ামে ৭ জুলাই ফাইনাল শুরু হল অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে। ১৫টি টানা পাস খেলে হল্যান্ড উপস্থিত হল পশ্চিম জার্মানির পেনাল্টি বক্সে। যোহান ক্রুয়েফকে ফেলে দেওয়ায় পেনাল্টি পেল হল্যান্ড। তখন পর্যন্ত জার্মানরা বলে পা ছোঁয়াতে পারেনি। বিশ্বকাপ ফাইনালে এই প্রথম পেনাল্টি। গোল খেয়ে জার্মান দল কিন্তু তেতে উঠল। শেষপর্যন্ত ২-১ গোলে জিতল। পশ্চিম জার্মানির গোলদাতারা : পেনাল্টি থেকে ব্রাইটনার ও মুলার। হল্যান্ডের নিসকেন্স। ফিফা বিশ্বকাপ প্রথমবার পেলেন জার্মান অধিনায়ক বেকেনবাওয়ার।

একাদশ বিশ্বকাপ : ১৯৭৮

ফাইনালে উঠে এবারও পারল না হল্যান্ড। বুয়েনস আইরেসের রিভার প্লেট স্টেডিয়ামে নিজেদের মাঠে তাদের হারিয়ে দিল আর্জেন্টিনা, অতিরিক্ত সময়ের খেলায়। ফল ৩-১। গোল দিলেন আর্জেন্টিনার কেম্পেস (২), বার্তোনি। হল্যান্ডের ন্যানিংগা।

দ্বাদশ বিশ্বকাপ : ১৯৮২

ফাইনালে পেনাল্টি নষ্ট করেও শেষপর্যন্ত তৃতীয়বারের জন্য বিশ্বকাপ তুলে নিল ইতালি। মূলত চতুর পাওলো রোসির দক্ষতার কাছে আত্মসমর্পণে বাধ্য হল পশ্চিম জার্মানি। স্পেনের বের্নাবিউ স্টেডিয়ামে ইতালির পক্ষে গোল দিলেন রোসি, তারদেলি ও আলতোবেলি। জার্মানির পক্ষে ব্রাইটনার।

ত্রয়োদশ বিশ্বকাপ : ১৯৮৬

এই বিশ্বকাপকে বলা হয় 'মারাদোনার বিশ্বকাপ'। মারাদোনা একাই আর্জেন্টিনাকে পাইয়ে দিলেন মেক্সিকোর বিশ্বকাপ। প্রতিটি ম্যাচে বিপক্ষকে ছত্রখান করেছেন তিনিই। ফাইনালে পশ্চিম জার্মানিকে আর্জেন্টিনা হারায় ৩-২ গোলে। আর্জেন্টিনার গোল দিলেন ব্রাউন, ভালদানো ও বুরুচাগা।

খেলাধুলো

শিবাজি গঙ্গোপাধ্যায়

অনেকরকম দাঁড়ানোর পদ্ধতি

কয়েকটি সংখ্যায় কিওকুশিন ক্যারাটের কনুই দিয়ে আঘাত করার কৌশল নিয়ে আলোচনা করেছি। কিওকুশিন ক্যারাটের বিভিন্ন রকম দাঁড়ানোর পদ্ধতিকে জাপানি ভাষায় বলে 'দাচি', ইংরেজিতে বলে 'স্টান্স'। এবার দাঁড়ানোর পদ্ধতি নিয়ে কয়েকটি সংখ্যায় আলোচনা করব।

এই দাঁড়ানোর বিভিন্ন রকম ভঙ্গি ক্যারাটেতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একজন ক্যারাটেকার পূর্ণতা লাভের জন্য দুটো জিনিসের বিশেষ দরকার। প্রথমটি হল দাঁড়ানোর সঠিক ভঙ্গি, দ্বিতীয়টি হল কৌশল প্রয়োগ। প্রথমটির জাপানি নাম হল 'দাচি' এবং দ্বিতীয়টির জাপানি নাম 'ওয়াজা'। এই দুটির কোনও একটি বাদ দিয়ে একজন ভাল ক্যারাটেকা হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। এবারে আমি দু'রকম দাঁড়ানোর ভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমটির নাম 'ফুদো দাচি' এবং দ্বিতীয়টির নাম 'মুসুবি দাচি'।

ফুদো দাচি : এই দাঁড়ানোর ভঙ্গি সাধারণত ক্যারাটে অনুশীলনের শুরুতে প্রয়োজন হয়। অন্যান্য দাঁড়ানোর ভঙ্গি এই ভঙ্গি থেকে রপ্ত করা হয়। এই দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে প্রথমত, দুটো পায়ের পাতার গোড়ালি ও আঙুলের অংশ একই লাইনে সমানভাবে থাকবে, দুটো পায়ের পাতার মধ্যে এক কাঁধ সমান চওড়া ফাঁক থাকবে, পায়ের পাতার গোড়ালির অংশ ভেতর দিকে এবং আঙুলের অংশ বাইরের দিকে থাকবে। শরীর, বিশেষ করে শিরদাঁড়া সোজা রেখে দাঁড়াতে হবে। হাত দুটো শরীরের পাশে কনুই থেকে একটু মুড়ে হাতের মুঠো শক্ত রেখে একটু সামনের দিকে এগিয়ে রাখতে হবে।

মুসুবি দাচি : এই দাঁড়ানোর ভঙ্গিটাও মোটামুটি শুরুর সময়ে প্রয়োজন। এই ভঙ্গিতে দাঁড়ানোর সময় শরীর সোজা রেখে, হাঁটু সোজা রেখে পা দুটো জোড়া করে রাখতে হবে। পা জোড়ার সময় পায়ের গোড়ালি দুটো স্পর্শ করে থাকবে এবং আঙুলের অংশ বাইরের দিকে রাখতে হবে। আঙুলের অংশ বাইরের দিক থেকে গোড়ালির কাছে মোটামুটিভাবে ৬০ ডিগ্রি কোণ করে থাকবে।

ফোটো : উৎপল সরকার

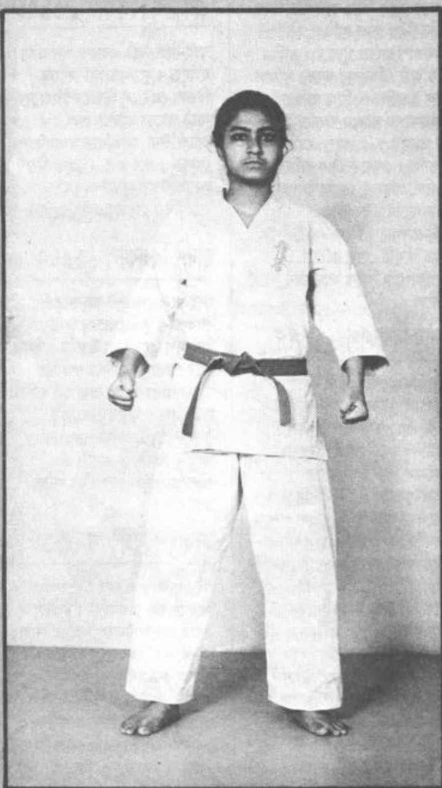

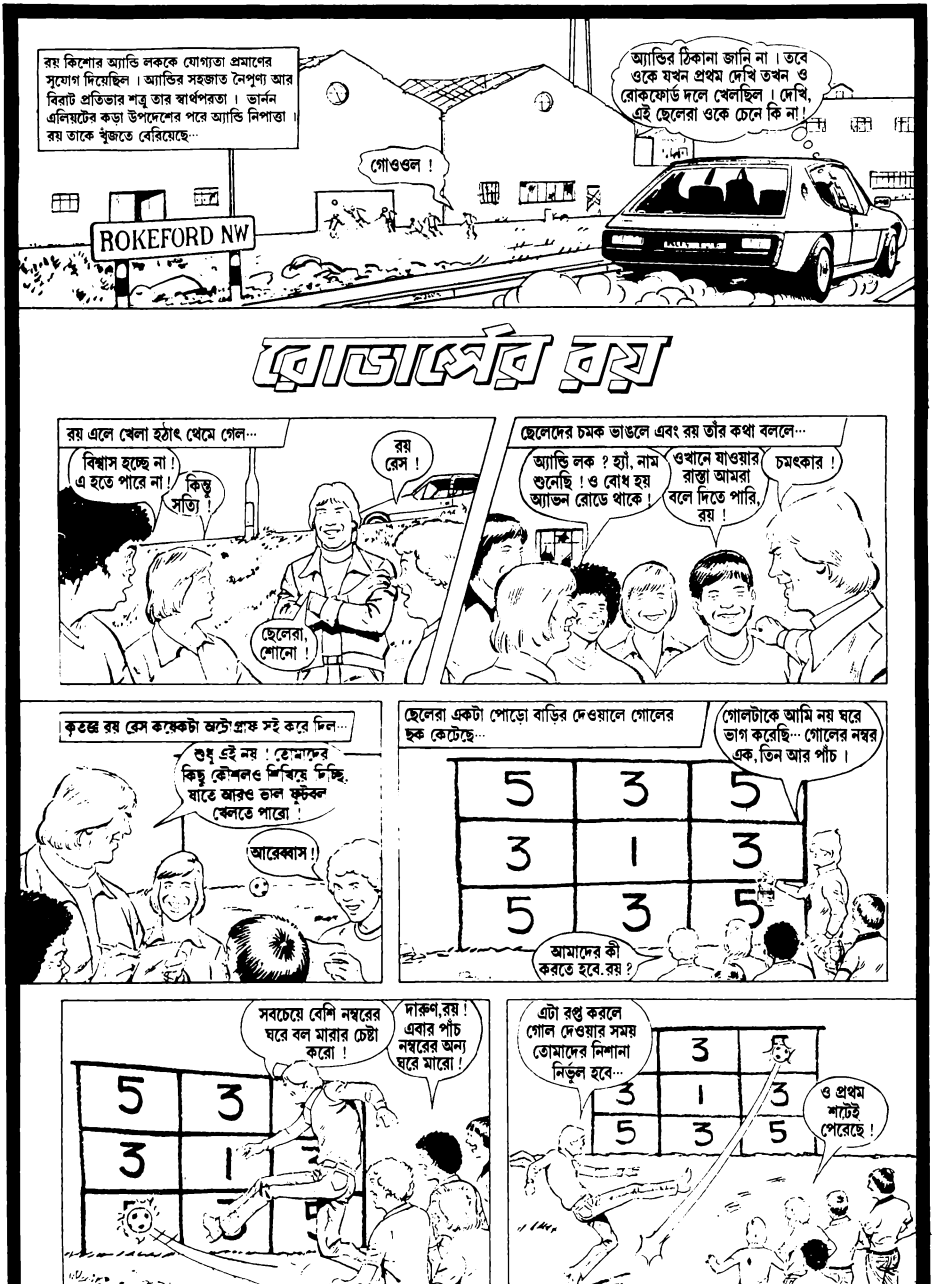

রয় কিশোর অ্যান্ডি লককে যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ দিয়েছিল । অ্যান্ডির সহজাত নৈপুণ্য আর বিরাট প্রতিভার শত্রু তার স্বার্থপরতা । ভার্নন এলিয়টের কড়া উপদেশের পরে অ্যান্ডি নিপাত্তা । রয় তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে…
গোওওল !
অ্যান্ডির ঠিকানা জানি না । তবে ওকে যখন প্রথম দেখি তখন ও রোকফোর্ড দলে খেলছিল । দেখি, এই ছেলেরা ওকে চেনে কি না !
ROKEFORD NW
রোভার্সের রয়
রয় এলে খেলা হঠাৎ থেমে গেল…
বিশ্বাস হচ্ছে না ! এ হতে পারে না !
কিন্তু সত্যি !
রয় রেস !
ছেলেরা, শোনো !
ছেলেদের চমক ভাঙলে এবং রয় তাঁর কথা বললে…
অ্যান্ডি লক ? হ্যাঁ, নাম শুনেছি ! ও বোধ হয় অ্যাভন রোডে থাকে !
ওখানে যাওয়ার রাস্তা আমরা বলে দিতে পারি, রয় !
চমৎকার !
কৃতজ্ঞ রয় রেস কয়েকটা অটোগ্রাফ সই করে দিল…
শুধু এই নয় ! তোমাদের কিছু কৌশলও শিখিয়ে দিচ্ছি, যাতে আরও ভাল ফুটবল খেলতে পারো !
আরেব্বাস !
ছেলেরা একটা পোড়ো বাড়ির দেওয়ালে গোলের ছক কেটেছে…
গোলটাকে আমি নয় ঘরে ভাগ করেছি… গোলের নম্বর এক, তিন আর পাঁচ ।
5 3 5
3 1 3
5 3 5
আমাদের কী করতে হবে, রয় ?
সবচেয়ে বেশি নম্বরের ঘরে বল মারার চেষ্টা করো !
দারুণ, রয় ! এবার পাঁচ নম্বরের অন্য ঘরে মারো !
এটা রপ্ত করলে গোল দেওয়ার সময় তোমাদের নিশানা নির্ভুল হবে…
ও প্রথম শটেই পেরেছে !

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

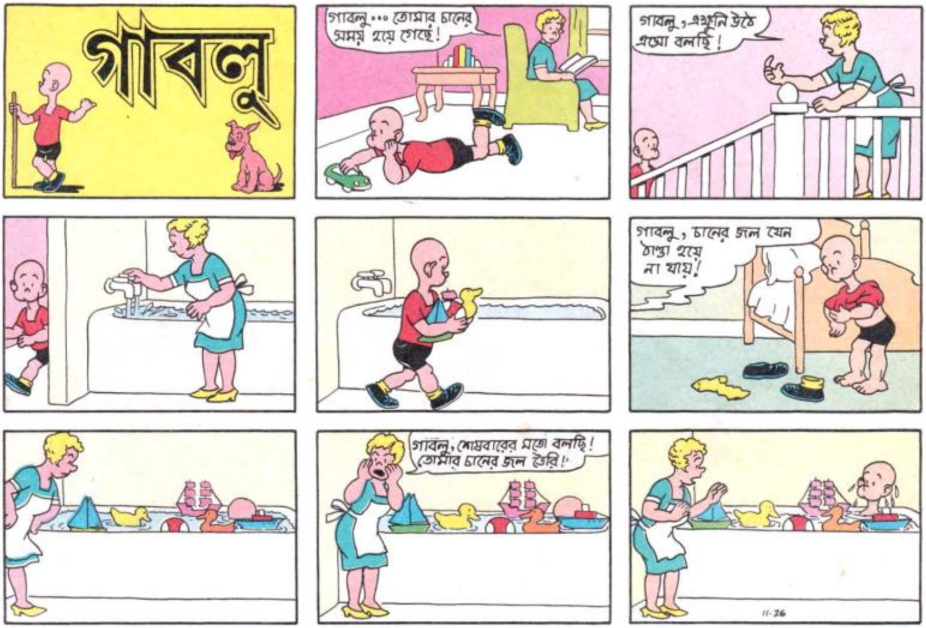
গাবলু
গাবলু ••• তোমার চানের সময় হয়ে গেছে!
গাবলু, এখুনি উঠে এসো বলছি!
গাবলু, চানের জল যেন ঠাণ্ডা হয়ে না যায়!
গাবলু, শেষবারের মতো বলছি! তোমার চানের জল তৈরি!
11-26

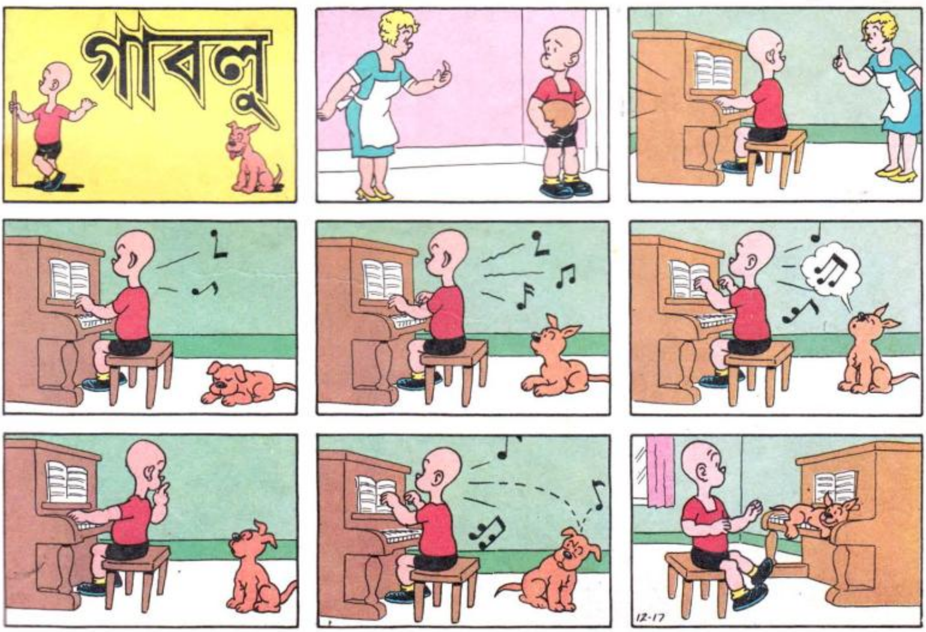
গাবলু
12-17

সম্পূর্ণ উপন্যাস

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

বনে-জঙ্গলে

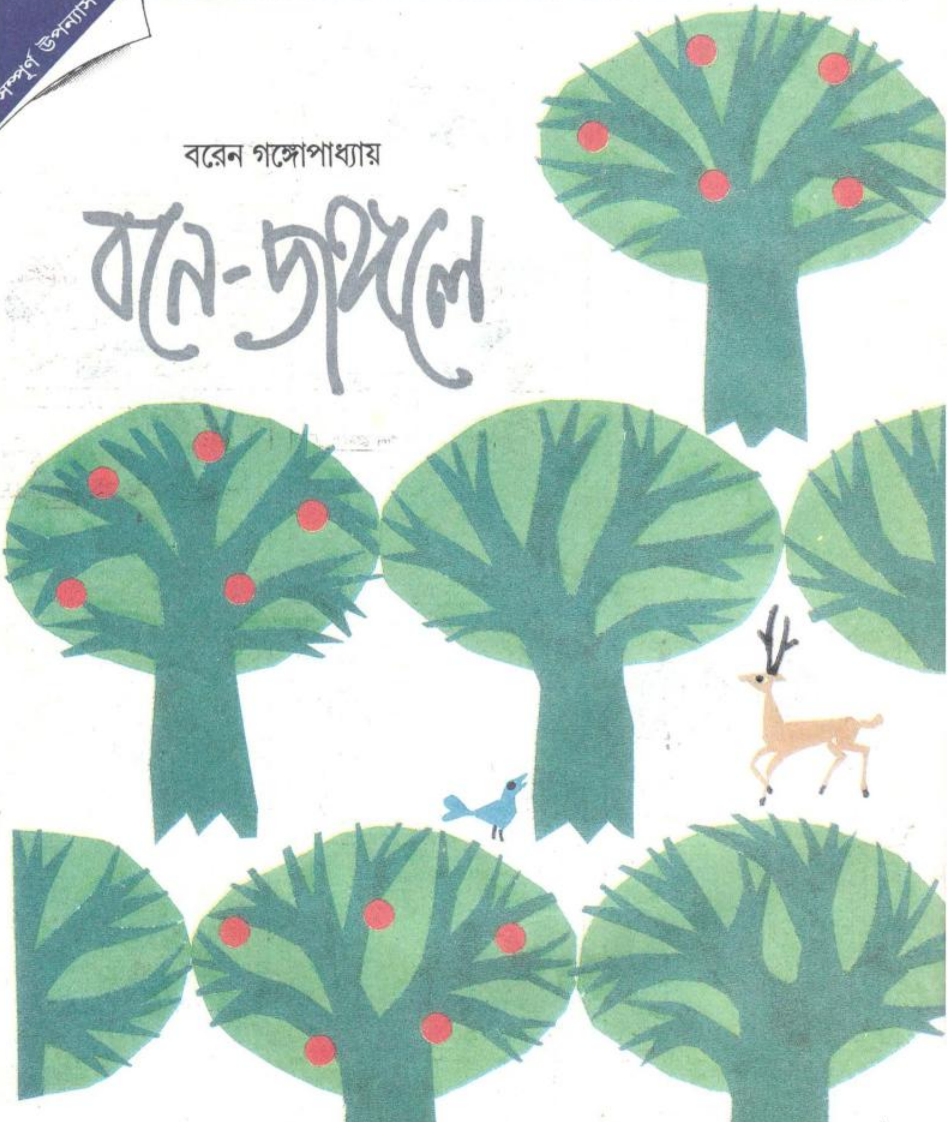

বাড়ির দরজায় হঠাৎ একটা জিপের হর্ন বেজে উঠতেই চমকে উঠেছিলাম, কেউ এল নাকি রে বাবা ! কে আসতে পারে এই অসময়ে ! তাও আবার জিপ চালিয়ে !

বাড়িটা এখন প্রায় ফাঁকা, বাবা অফিসে, দিদি কলেজে, মা অবশ্য রান্নাঘরে, কিন্তু কী খুটুরখাটুর করছেন কে জানে ! আর বাড়ির কাজের মেয়ে সোমবারি টিউবওয়েল পাম্প করে খাওয়ার জল তুলছে। এই বেলা প্রায় বারোটার সময়ে জিপ নিয়ে আবার কে আসতে পারে !

ঘরের দরজা খুলে বেরিয়েই আমি অবাক, "ও মা ব্রজদা !" দেখি, জিপে স্টিয়ারিং-এর সামনে বসে ব্রজদা। পরনে সেই ওভারকোট, মাথায় নেপালি টুপি, পায়ে গামবুট। হাতের দু' আঙুলে মোটা একটা চুরুট থেকে সরু সুতোর মতো ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারি না, "ব্রজদা আপনি !"

ব্রজদার হাসি-হাসি মুখ, "ভাল আছিস তো সব ? নতুন একটা ফরেস্টে যাব বলে বেরিয়েছিলাম। তা, এদিক দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ তোদের কথা মনে পড়ে গেল। ভাবলাম দেখা করেই যাই।"

ব্রজদাকে কাছে পাওয়া দারুণ ব্যাপার। সারাজীবন একা-একাই পৃথিবীর কোথায় না কোথায় ঘুরেছেন। কত মজার-মজার অভিজ্ঞতার গল্প যে ওঁর মুখ থেকে শোনা যায়, তার শেষ নেই। সেসব গল্প কেউ যদি লিখে ফেলত তা হলে তা একটা বিশাল বই হয়ে যেত।

ব্রজদা চুরুট হাতেই গাড়ি থেকে নামলেন, তারপর বাড়ির দিকে একবার তাকালেন, "তোর বাবা কোথায় ? বাবা নেই ?"

"বাবা তো এখন অফিসে ব্রজদা। দিদি কলেজে। তাতে কী, আসুন না, মা আছেন !"

মায়ের কথা বলতে-না-বলতেই মাকে দেখা গেল, দরজার বাইরে বেরিয়ে এসেছেন. "ও মা, ব্রজবাবু যে ! আমরা তো ভেবেছিলাম, আমাদের বুঝি ভুলেই গেছেন।"

ব্রজদা একটু হাসলেন, "ভুলে গেলে আর এলাম কী করে ! আসলে সাত-কাজের ঝামেলায় থাকি, সময়ই পাই না। তার ওপর আবার সেই বাতিকটা আমার এখনও রয়ে গেছে।"

বাতিক বলতে যে কী, আমরা সবাই তা জানি। কাজকর্মের ফাঁকে একটু সময় পেলেই ব্রজদাকে আর পায় কে ! কোথায় ? না, ফরেস্টে। জঙ্গলের গাছপালা, পশুপাখি আর জন্তু-জানোয়ার দেখে কী যে সুখ পান ব্রজদা, উনিই জানেন।

মা বললেন, "তা বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, ঘরে আসুন। নিশ্চয়ই খাওয়া-দাওয়া হয়নি ?"

"খাওয়া !" ব্রজদা একটু হাসলেন, "খাওয়া অবশ্য যে-কোনও একটা চটিতেই সেরে নিতে পারতাম ; তা ভেবে দেখলাম, অনেকদিন ডাল, ভাত, চচ্চড়ি-মচ্চড়ি খাইনি, তাই সটান এখানেই চলে এলাম।"

ব্রজদা একা মানুষ। বিয়ে-থা করেননি। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যাও কম নয় ওঁর। কিন্তু কোনও সংসারে যে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবেন তাও কখনও করলেন না। এ-নিয়ে কিছু বললে হাসেন, "বেশ তো আছি, সারা পৃথিবীটাই তো আমার সংসার। তাই না ?"

মা বললেন, "ব্রজবাবুকে তোর ঘরে নিয়ে গিয়ে বসা মন্টু। একটু কফি করে আনি, কফি-টফি খেয়ে বিশ্রাম নিয়ে চানটান করে নিন। খাবার তৈরিই আছে।"

"আসুন ব্রজদা। আপনাকে দেখে যে কত ভাল লাগছে বোঝাতেই পারব না।"

"আমারও খুব ভাল লাগছে রে। কতদিন পরে তোদের সঙ্গে

আবার দেখা হল।"

ঘরে ঢুকেই ব্রজদা আমার খাটের ওপর গামবুটসমেত পা তুলে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন, "তা, একটা কাজ কর দেখি, গাড়িতে আমার ব্যাগ রয়েছে, ওটা নিয়ে আয়।"

ব্রজদার ফাই-ফরমাশ খাটতে বিন্দুমাত্র আমার কষ্ট নেই। ছুটে গিয়ে ভারী ক্যাম্বিসের ব্যাগটা নিয়ে এলাম।

"রাখ ওখানে। বুঝলি, হাতে দিন-চারেকের সময় পেয়ে গেলাম, আর অমনি মনটা কেমন আনচান করে উঠল। কতদিন জঙ্গলে ঢুকে জন্তু-জানোয়ার দেখিনি রে, ভাবতেই পারি না।"

"তাই বুঝি! কোন জঙ্গলে এবার যাবেন ব্রজদা?"

"সে যে-কোনও একটায় গেলেই হয়। কাছাকাছির মধ্যে তো নন্দনবনই রয়েছে। ওখানেও যেতে পারি। ওখানে গেলেও নানারকম জন্তু-জানোয়ার দেখা যায়। অনেক ভ্যারাইটি।"

কথা বলতে-বলতেই ব্রজদা উঠে বসলেন, গামবুট খুলে একপাশে রাখতে-রাখতে বললেন, "তা, গত বছর বুঝলি, ওই নন্দনবনে একটা দারুণ জিনিস দেখেছিলাম। রাত তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, হঠাৎ চৌকিদার এসে ডেকে তুলল, "সাব, সাব, বাইরে আসুন।"

"কী ব্যাপার! ধড়মড় করে উঠে বাংলোর ফেনসিংয়ের কাছ পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে দেখি, হাত-পঞ্চাশেক দূরে একটা নেকড়ে বসে আছে। নেকড়ে চিনিস তো?"

"বা রে, নেকড়ে চিনব না! চিড়িয়াখানায় কত দেখেছি।"

ব্রজদা নেভা চুরুটটা আবার ধরিয়ে নিতে-নিতে একটু হাসলেন, "চিড়িয়াখানার নেকড়ে আর বনের ভিতর ঘুরে বেড়ানো নেকড়ে আকাশ-পাতাল তফাত। তা যাকগে, কী হয়েছিল শোন, দেখি, নেকড়েটা গা এলিয়ে আরাম করে বসে আছে, আর ওর গায়ের ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছে তুলোর বলের মতো কয়েকটা বাচ্চা নেকড়ে। ভাবতে পারিস?"

দৃশ্যটা আমার চোখের ওপরও ভেসে উঠল। আমাদের বাড়ির পুষি বেড়ালও ওরকম বাচ্চা নিয়ে খেলা করত।

ব্রজদা বললেন, "সেই বাচ্চা তখন চুকচুক করে মায়ের দুধ খেত, এখন না-জানি কত বড় হয়ে উঠেছে। তুই বল, দেখতে ইচ্ছে করে না ওদের?"

এক বছরের মধ্যে নেকড়ের বাচ্চা কত বড় হতে পারে, আমার ধারণা নেই। বললাম, "এখন গেলে সেই বাচ্চাগুলোকে কি চিনতে পারবেন?"

"এটা একটা প্রশ্ন বটে!" ব্রজদা ওভারকোটটা খুলে ব্র্যাকেটে ঝুলিয়ে রাখলেন। "তবে জঙ্গলের ভেতর নেকড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হরিণ ঘুরে বেড়াচ্ছে, গাছের এ-ডাল থেকে ও-ডালে বাঁদর লাফাচ্ছে, দেখতে ইচ্ছে করে না?"

আসলে ব্রজদার এটা একটা নেশা। এ নেশা যে ব্রজদার কোনওদিন যাবে না তা আমরা ভালই বুঝতে পারি। বললাম, "বনে-জঙ্গলে যে এভাবে ঘুরে বেড়ান, বিপদ হতে পারে না? এই তো সেদিন কাগজে দেখলাম, একটা পোষা হাতি তার মাহুতকে পায়ের নীচে পিষে মেরে ফেলেছে।"

ব্রজদার চুরুটটা নিভে গিয়েছিল, আবার ধরিয়ে নিলেন, "তা বললে তো মানুষও মানুষকে খুন করে। হাতি যদি কাউকে মেরে ফেলে তা হলেই দোষ, আর মানুষ যদি মানুষকে মারে তা হলে দোষ নয়?"

"না না, দোষের কথা বলছি না ব্রজদা। বিপদের কথা বলছি।"

ব্রজদা আবার হাসলেন, "চল না একবার আমার সঙ্গে, বনের জন্তু-জানোয়াররা মানুষের চেয়ে কত ভাল দেখে আসবি।"

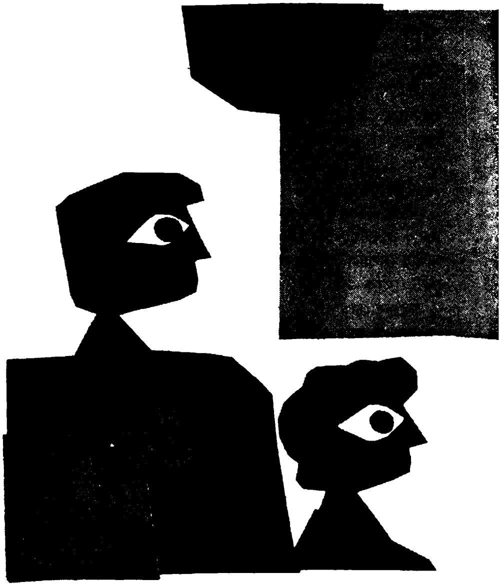

"জঙ্গলে?" আমি প্রায় লাফিয়ে উঠেছিলাম। আর ঠিক এই সময়ই মা এসে ঘরে ঢুকলেন। হাতে একটা প্লেটে খান-কয়েক মাছভাজা আর দু' কাপ কফি।

"নিন ব্রজবাবু, এটুকু খেয়ে নিন দেখি। তারপর চানটান করে ভাত খাবেন চলুন।"

"বাহ্, ফাইন।" আগ্রহে মাছভাজার প্লেটটা তুলে নিলেন ব্রজদা, "বিউটিফুল।"

আমি ঘড়ির দিকে তাকালাম, সাড়ে বারোটা। নেহাত ব্রজদার জন্যই আমার ভাগ্যেও এ-সময় এক কাপ কফি। কাপটা তুলে নিলাম।

"তা ব্রজবাবু, এতদিন পরে যখন আমাদের মনে পড়েছে, এবার কয়েকটা দিন এখানেই থেকে যান না। মন্টুর বাবা তো প্রায়ই আপনার কথা বলেন।"

আমিও লাফিয়ে উঠি, "হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা খুব ভাল হবে। ব্রজদাকে এবার আমরা ছাড়ব না।"

মাছভাজা থেকে একটু ভেঙে মুখে দিলেন ব্রজদা, "থাকতে তো যে-কোনও সময়ই পারি, আসলে ওই যে বললাম না, নেকড়ের বাচ্চাগুলো এতদিনে কত বড় হয়েছে না দেখা পর্যন্ত আমার ভাতই হজম হবে না।"

মা কিছুই বুঝতে পারেন না, "ও মা, সেটা আবার কী কথা?"

বললাম, "ব্রজদা গতবছর জঙ্গলে কয়েকটা নেকড়ের বাচ্চা দেখেছিলেন, সেগুলোর কথা বলছেন।"

"নেকড়ের বাচ্চা!" মা ফিক করে একটু হেসে উঠেই মুখে আঁচল চাপা দিলেন, "ওসব তো চিড়িয়াখানায় গেলেই দেখা যায়।"

"যায়, তবে··· যাকগে, এর পরেরবার যখন আসব তখন ক'দিন না হয় এখানেই থেকে যাব।"

মাছের ডিশটা ততক্ষণে প্রায় ফাঁকা করে তুলেছিলেন ব্রজদা। হঠাৎ খেয়াল হওয়ায় বললেন, "ও কী রে, তুই খেলি না ? সব তো আমিই খেয়ে ফেললাম।"

"না না, ওটা আপনার জন্যই আনা। ও তো সব সময়ই খায়।"

আমিও বললাম, "হ্যাঁ ব্রজদা, আপনি খান। আমি তো খাই-ই।"

বললাম বটে, দেখি, ব্রজদা ততক্ষণে মাছের শেষ টুকরোটাও মুখে পুরে ফেলেছেন।

মা বললেন, "তা হলে আজকের দিনটা আছেন তো ? রাতে কিন্তু ফ্রায়েড রাইস করব।"

ব্রজদা হাসলেন, "সে দেখা যাবে'খন। তা আমি ভাবছিলাম, মন্টুকে এবার সঙ্গে নিয়ে গিয়ে জঙ্গল দেখিয়ে আনি। ওরা তো ঘরকুনো হয়েই এতখানি বড় হয়েছে। জঙ্গল বলতে যে কী, একবার যদি আমার সঙ্গে যাস মন্টু, বুঝতে পারবি।"

জঙ্গল হোক আর যেখানেই হোক, ব্রজদার জিপে চড়ে কোথাও যেতে পারা যে একটা দারুণ ব্যাপার, ভাবলেই বুকের ভেতর যেন রেলগাড়ি চলতে শুরু করে। "সত্যি-সত্যি আমাকে নিয়ে যাবেন ব্রজদা ?"

"নিয়ে যাব না কেন, আমিই তো বলছি। জিপে যাবি, জিপে আসবি। জঙ্গলে গিয়ে আমরা বাংলোয় উঠব। চৌকিদারের হাতের রান্না খাব। দেখিস, কত খাতির করে চৌকিদার।"

মায়ের মুখটা ততক্ষণে যেন শুকিয়ে উঠেছে, "না বাবা, ওসবে কাজ নেই। এতখানি বয়স হল, আমাদের ছেড়ে কোথাও থেকেছে নাকি ! শেষটায় ওকে নিয়ে গেলে আপনিই ঝামেলায় পড়বেন ব্রজবাবু।"

আমি বললাম, "আমার তো পরীক্ষা হয়ে গেছে মা, এখন আর কারও ঘরে বসে থাকতে ভাল লাগে ! না ব্রজদা, আমি যাবই।"

ব্রজদা কফির কাপটা একপাশে সরিয়ে রাখলেন, তারপর আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে একটু হাসলেন, "জঙ্গলে গেলেই যে তোর ভাল লাগবে, এমন কিন্তু না-ও হতে পারে। বুঝলি, সেবার আমার এক বন্ধুকে নিয়ে অসমের জঙ্গলে গিয়েছিলাম। ভাবলাম দু' চোখ ভরে দু'জনে গণ্ডার দেখে আসব। তা বন্ধুটির জঙ্গলে ঢুকে তো মন খারাপ। বলে কী জানিস, ধুস, এখানে এত কষ্ট করে কখনও মানুষ আসে। কেবল ঝোপঝাড় আর গাছপালা। কখন তার ভেতর দিয়ে কী-একটা দৌড়ে যাবে, তার জন্য অপেক্ষা করা। না বাপু, তার চেয়ে কোনও ট্যুরিস্ট-স্পটে গিয়ে মজাসে খাওদাও, কেনাকাটা করো, কত ভাল ব্যাপার !"

"জানিস, রাগে আমার সারা শরীর জ্বলে যাচ্ছিল, কিন্তু কী করি ! বন্ধু বলে কথা ! সে যাত্রাটা গণ্ডার দেখা তো দূরের কথা, একটা পাখিটাখি যে ভাল করে দেখব, তাও হয়ে উঠল না। তাই চট করে এখন আর কাউকে সঙ্গে নিতে চাই না।"

মনে-মনে রোখ চেপে যাচ্ছিল, ব্রজদার সঙ্গে যেতেই হবে। জঙ্গলের এমন কী আকর্ষণে ব্রজদা মেতে রয়েছেন, দেখতেই হবে। বললাম, "আমি কিন্তু ব্রজদা, জঙ্গলের ভেতর আপনি যেভাবে বলবেন, সেভাবেই চলব।"

মা আবার খিটখিট করে উঠলেন, "থাম দেখি, এখনও তো তোর ভূতের ভয়ই কাটেনি, তুই যাবি কী রে ! আপনি এবার চান করে নিন ব্রজবাবু, অনেক বেলা হয়ে গেছে।"

ব্রজদা কেবল মৃদু-মৃদু হাসছিলেন, ভূতের কথা শুনে হা হা করে হেসে উঠলেন, "ভূত আবার কী রে ? কীরকম দেখতে বল তো ?"

"না না, ব্রজদা আমি একদম ভয় পাই না।" লজ্জায় আমার দুটো কান লাল হয়ে উঠেছিল।

মা বললেন, "তোরা আর বসে থাকিস না মন্টু, যা, চান করে আয় তাড়াতাড়ি। বলতে-বলতে মা আবার রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন।

বললাম, "আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে যাবই ব্রজদা। আচ্ছা ব্রজদা, একটা কথা বলব ?"

"কী কথা ?"

"আমার দুই বন্ধু তপু আর খোকাকে তো আপনি চেনেন, ওদের যদি সঙ্গে নিই, খারাপ হবে ? ওরা কিন্তু খুব খুশি হবে।"

ব্রজদা আবার হেসে উঠলেন, "এটা কি পিকনিক পার্টি নাকি রে ? বন্ধুবান্ধব মিলে জঙ্গলে গিয়ে হইচই করা আমি একদম পছন্দ করি না। তোর যদি সাহস থাকে তো চল, তোকে দেখিয়ে আনি। তবে মনে রাখবি, জঙ্গল হচ্ছে অনাবিল শান্তির জায়গা। চোখ-কান খুলে সেই শান্তি কেবল উপভোগ করবি। ওখানে গিয়ে এটা পাচ্ছি না, ওটা হল না বলে ঘ্যানঘ্যান করা চলবে না।"

বলতে-বলতে মাথার টুপিটা খুলে টেবিলের একপাশে রাখতেই বিরাট একটা টাক চোখের ওপর ভেসে উঠল। অন্য সময় হলে এই টাক নিয়ে কিছুটা মজা করা যেত, কিন্তু এখন অসম্ভব। ব্রজদা ওকে জঙ্গলে নিয়ে যাবেন, কে এখন ব্রজদার টাক নিয়ে কথা বলে !

বললাম, "ব্রজদা, আপনি যেভাবে বলবেন আমি ঠিক সেইভাবে থাকব। মাকে আপনি একটু বোঝান না ব্রজদা, দু'-তিনদিন পরেই তো আবার আমরা ফিরে আসব।"

ব্রজদা বললেন, "ঠিক আছে, চল এখন চানটা সেরে নিই।"

ব্রজদার জন্য এখন আমি জীবনও দিতে পারি। বললাম, "আসুন।"

সন্ধেবেলা সারা বাড়ি জমজমাট হয়ে উঠল। বাবা তো ব্রজদাকে দেখে একেবারে জড়িয়েই ধরলেন, "কী ব্যাপার, আমাদের একেবারে

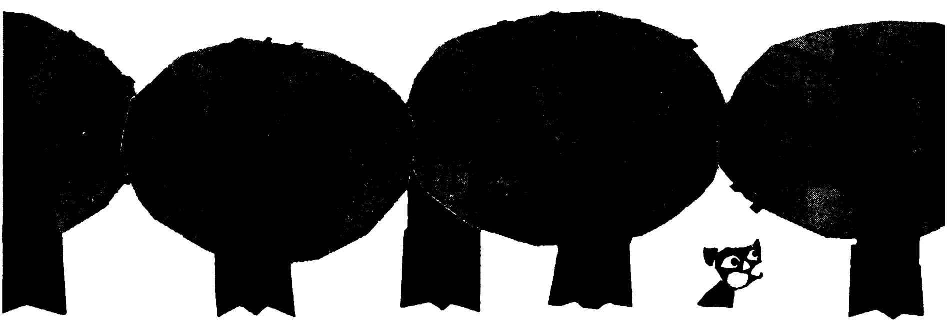

ভুলেই গেছেন দেখছি। মাঝেসাজে এক-আধবার এলেও তো পারেন।"

দিদিও কলেজ থেকে ফিরেই অবাক, "ও মা ব্রজদা! তাই তো ভাবি, দরজায় জিপ দাঁড়িয়ে কেন! জানেন ব্রজদা, আপনার সেই বাঘের গল্পটা আমি আমাদের কলেজের বন্ধুদের সবাইকে বলেছি, কেউ কিন্তু বিশ্বাসই করেনি।"

ব্রজদা চুরুটের ছাইং ঝাড়তে-ঝাড়তে তাকালেন, "কোনটা রে শ্যামলী? জীবনে তো বহুবার বাঘের পেছনে ছুটেছি, কোনটার কথা বলছিস?"

"ও মা, ভুলে গেলেন! সেই যে সুন্দরবনের জঙ্গল, যারা মধু সংগ্রহ করতে যায়। মাউলি না কী বলে! সেই এক মউলি মধু আনতে গিয়ে জঙ্গলে ঢুকে একটা বাঘের মুখে পড়েছিল।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ।" যেন মনে পড়ে গেছে ব্রজদার, "তা অবিশ্বাস করার কী আছে? আমি কখনও বানিয়ে বলি না।"

কোন গল্পটা আমি ঠিক ধরতে পারছিলাম না। বললাম, "কী হয়েছিল ব্রজদা?"

"শুনিসনি? তা হলে শোন। তোরা তো জানিস, যেখানে জঙ্গল সেখানেই তোদের ব্রজদা। তা, এত জঙ্গল আমি দেখেছি, কিন্তু সুন্দরবনের জঙ্গল একেবারে আলাদা। সারা পৃথিবীতে এরকম আর-একটা জঙ্গল কোথাও আছে কি না আমার জানা নেই। আর সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতো বাঘও আর কোথাও আছে বলে শুনিনি। তা বুঝলি মন্টু, অনেকদিন আগে একবার সেই জঙ্গল দেখতে গিয়েছিলাম। ক্যানিং থেকে লঞ্চ ধরে এলাম গোসাবায়।

"জঙ্গলে ঢুকতে হলে গোসাবা থেকে একটা নৌকো ভাড়া করা দরকার। একে-তাকে ধরে শেষপর্যন্ত একটা নৌকোও জোগাড় হল। নৌকার মাঝি মোহর আলি। বুঝলি, খুব মজাদার মানুষ এই মোহর। বলল, 'কর্তা, সুন্দরবনে যাবেন, বড়ে মিঞার দেখা পাবেন কি না সন্দেহ। তবে দু-চারটে হরিণ-টরিন দেখতে পাবেন। আর কুমির অনেক পাবেন। কুমিরগুলো সব ডাঙায় উঠে রোদ পোহায়।'

"রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার দেখার জন্যই তো সুন্দরবন যাওয়া। বললাম, 'সে কী গো, বাঘ দেখাতে পারবে না?'

"মোহর হাসে, 'কপালে থাকলে দেখতেও পারেন। তবে তেমন কপাল ক'জনের থাকে!'

"লোকটার কথা শুনে কেমন রহস্য-রহস্য লাগছিল। বললাম, 'হ্যাঁ গো মোহর, তুমি তো আগে জঙ্গল থেকে মধু সংগ্রহ করে আনতে বলে শুনেছি। বাঘ দ্যাখোনি?'

"মোহর হাসে। সরল মানুষ, সরল হাসি। বলল, 'বাঘ আবার দেখিনি? কতবার বাঘের মুখোমুখি পড়ে বেঁচে এসেছি।'

"'তাই বুঝি! আহা শোনাও না, তোমার বাঘ দেখার গল্প শুনি।'

"মোহর তখন রসিয়ে-রসিয়ে আমাকে একটা ঘটনা বলেছিল।"

ব্রজদা দিদির দিকে তাকালেন, "তা সে গল্প অবিশ্বাস করল কেন! আসলে তোরা জঙ্গল-মঙ্গল কিছুই তো দেখিসনি, তাই সব কিছু হেসে উড়িয়ে দিস।"

বললাম, "গল্পটা কী শোনান না ব্রজদা?" মোহর আলির বাঘ দেখার গল্পটা শোনার জন্য আমি ছটফট করছিলাম।

দিদি আর কোনও কথা বলে না, চুপ করেই থাকে।

ব্রজদা বললেন, "শোন তা হলে। মোহর আলি জনা দশেক লোকের সঙ্গে একবার বনদেবীর পুজো দিয়ে মধু আনবার জন্য জঙ্গলে ঢুকল। সুন্দরবন হচ্ছে জোয়ার-ভাটার দেশ। জালের মতো চারদিকে ছড়ানো নদী, আর তার মাঝে-মাঝে এক-একটা জঙ্গল-ঘেরা দ্বীপ। জোয়ারে নদীর জল যখন ফেঁপেফুলে ওঠে, তখন দ্বীপগুলোর ডাঙার ভাগ ছোট হয়ে যায়, আবার যখন ভাটা শুরু হয়, তখন দ্বীপগুলো আকারে বড় হয়ে ওঠে। তা মোহররা যখন জঙ্গলে ঢুকল তখন ছিল জোয়ার। ওরা জঙ্গলে এদিক-সেদিক ঘুরতে শুরু করল। ঘুরতে শুরু করল আর ওপরের দিকে কেবল তাকাতে লাগল।

"মধু আনতে গেলে ওপর দিকে কেবল তাকাতে হয় কেন, জানিস তো?" প্রশ্ন করলেন ব্রজদা।

দিদি বলল, "মৌমাছি উড়ছে কি না লক্ষ করতে হয়। একটা মৌমাছি দেখলেই তার পেছন-পেছন ছুটতে হয়।"

ব্রজদা হাসলেন, "তোর তা হলে মনে আছে, এখনও? যাকগে শোন। মোহর আলি ওরকম একটা মৌমাছি দেখেই তাকে লক্ষ করতে-করতে ছুট লাগাল। ছুটবার সময় আর মনে ছিল না ও দলছাড়া হয়ে পড়ছে। ওর কেবল নজর মৌমাছিটা উড়তে উড়তে চাকের কাছে যাবে। একটা কোনও চাক যদি কোথাও দেখা যায়, তা হলে তার কাছাকাছি অনেক চাক পাওয়া যাবে।

"তা বুঝলি, হঠাৎ এক সময় ও থমকে দাঁড়াল, চারপাশে তাকিয়ে দ্যাখে, কেউ নেউ। কেউ নেই ঠিকই কিন্তু সামনের দিকে হাত পনেরো-কুড়ি দূরে ডোরাকাটা কম্বল গায়ে কী যেন একটা দাঁড়িয়ে। কী রে বাবা! কী ওটা?

"আরও দু' পা ও এগিয়েই বুঝতে পারল, সর্বনাশ, এ যে বাঘ।

"বাঘও ততক্ষণে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়ে জ্বল-জ্বল-করা চোখে মোহরের দিকে তাকিয়েছে।

"মোহর যে পালাবে, সে উপায় নেই। সুন্দরবনের এই কাদা-কাদা মাটিতে বাঘের সঙ্গে দৌড়ে কে পাল্লা দেবে! একচুলও নড়তে পারল

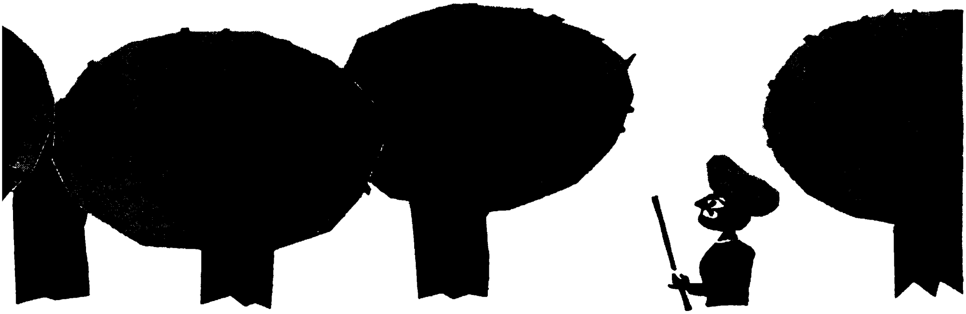

না ও। বাঘের দিকে মোহরও বড়-বড় চোখ করে তাকাল। ভাবখানা এরকম যেন, সাবধান, তুমি যদি এগোও, ছেড়ে কথা কইব না আমিও।

"বাঘটা এবার মাথাটাকে একবার নীচের দিকে নামাল, আবার ওপর দিকে তুলল। তুলেই গোঙাতে শুরু করল। ওদিকে বাঘের মুখ দিয়ে তখন লালা ঝরতে শুরু করেছে। চোখ দুটো যেন আগুনের গোলা হয়ে উঠেছে।

"তা হোক, মোহরও কম যায় না। বাঘ যেমন গোঁ-গোঁ করে, মোহরও একইভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে গোঁ-গোঁ শুরু করে দিল।

"বাঘ একটু পেছনের পায়ে ভর দিয়ে বসেই একবার গাঁক করে উঠল। কিন্তু লাফাল না।

"মোহরও একইভাবে গাঁক করে বাঘকে জবাব শুনিয়ে দিল।

"বাঘ যত রাগ দেখায়, মোহরও ছেড়ে কথা বলে না। গোঁ-গোঁ··· গাঁক, মোহরও গোঁ-গোঁ··· গাঁক।

"বুঝলি, এইভাবে প্রায় মিনিট দশ-পনেরো কেটে গেল। ওদিকে মোহর দল ছাড়া হয়ে গেছে দেখে ওর সঙ্গীরা সব চেঁচাতে-চেঁচাতে এগিয়ে আসছিল। আর, অত চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে বাঘটা এক সময় লেজ গুটিয়ে জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে গেল।"

দিদি বলল, "এটা সত্যি ঘটনা হতে পারে, কিন্তু আমার বন্ধুরা বলে গুল।"

ব্রজদা হাসলেন, "তোর বন্ধুদের বল, একবার তা হলে নিয়ে যাই সুন্দরবনে। দেখে আসুক।"

মা এ-সময় এক প্লেট কষা মাংস এনে হাজির, "একটু চেখে দেখুন তো ব্রজবাবু, ঝাল, নুন ঠিক আছে কি না!"

"আহ্ ফাইন!" ব্রজদার যেন তর সয় না, একটা টুকরো তুলে নিয়ে দাঁত দিয়ে চেপে ধরেন।

বাবা বললেন, "তোমার ফ্রায়েড রাইস কীরকম হয়েছে, একটু দেখালে না?"

"না না।"ব্রজদা বাধা দিলেন, "এখন না, রাতে তো খাবই।" বলতে-বলতে কুড়মুড় করে খানিকটা হাড় চিবিয়ে নিয়ে বললেন, "দারুণ। নিশ্চয়ই দিশি মুরগি?"

বাবা হাসলেন, "দিশি-বিলিতি বুঝি না ব্রজবাবু, বাজার থেকে আনা, আমাদের জানাশোনা দোকানদার।"

ব্রজদা আর-এক টুকরো হাতে নিয়ে বললেন, "কখনও বন-মুরগির মাংস খেয়েছেন? সে একবার সিকিমের জঙ্গলে গিয়ে খেয়েছিলাম। বাংলোর চৌকিদার রান্না করে খাইয়েছিল। এখনও জিভে লেগে আছে।"

বাবা বললেন, "চৌকিদারদের রান্নায় অনেক মোগলাই ব্যাপার থাকে। আমাদের এ তো ঘরোয়া রান্না।"

ব্রজদা মায়ের দিকে তাকালেন, "না না, আমি কিন্তু এ-রান্নার নিন্দে করছি না। আসলে বন-মুরগি এখানে আর কোথায়ই বা পাওয়া যাবে। হ্যাঁ রে মণ্টু, বন-মুরগির ব্যাপারটা জানিস তো?"

নতুন কিছু শোনার জন্য আমরা সবাই হাঁ করে তাকিয়ে থাকি।

ব্রজদা বললেন, "বন-মুরগি আর কিছুই না; দিশি-মুরগিগুলো জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে এলে দিনে-দিনে ওগুলোই বুনো হয়ে ওঠে।"

"দিশি-মুরগি জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে এলে জন্তু-জানোয়ারে খেয়ে ফেলে না?" প্রশ্ন করে আমি তাকিয়ে থাকি।

ব্রজদা হাসলেন, "তোরা দেখছি কিছুই জানিস না। লোকে মানত করে জানিস তো? সিকিমের অনেক গাঁয়েই মুরগি মানত করার রেওয়াজ আছে। ওখানকার মানুষ মানত করে গভীর জঙ্গলের ভিতর ঢুকে মুরগি ছেড়ে দিয়ে আসে। দুটো-চারটে মুরগি যে জন্তু-জানোয়ারে খেয়ে ফেলে না এমন নয়, তবে অনেক মুরগিই দু'-চারদিনের মধ্যে বাঁচার কলাকৌশল শিখে ফেলে। সেগুলিই আবার ডিম পাড়ে, বাচ্চা ফোটায়, একটা-দুটো মুরগি থেকে অনেক মুরগি হয়ে যায়।"

মাংসের প্লেটটা ততক্ষণে প্রায় ফাঁকা করে ফেলেছিলেন ব্রজদা। শেষ টুকরোটা নিয়ে প্লেটটা দিদির হাতে তুলে দিয়ে একগাল হাসলেন, "আসলে কী জানেন শশধরবাবু, জঙ্গলের নেশা মারাত্মক নেশা। গভীর জঙ্গলের মধ্যে একটা কুঁড়েঘর-টর বানিয়ে যদি বাস করতে পারতাম তা হলে যেন জীবন ধন্য হত।"

"তা হলে এবার থেকে তাই করুন না ব্রজবাবু।" বাবাও একটু হাসলেন।

"আরে মশাই, তার কি উপায় আছে! ব্যবসাপত্র নিয়ে আজকাল এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে, কী বলব! তারই মাঝে টুকটাক একটু সময় করে ঘুরে আসা।"

ফাঁক বুঝে এবার আমি বলেই ফেললাম, "ব্রজদার সঙ্গে আমিও এবার জঙ্গল দেখতে যাব বাবা।"

"তুই!" বাবা অবাক হয়ে তাকালেন।

ব্রজদা নতুন একটা চুরুট ধরাতে-ধরাতে বললেন, "চলুক না, বন-জঙ্গল তো কিছুই দ্যাখেনি ওরা, দেখে আসুক। ঘরের ছেলে আবার ঘরেই ফিরিয়ে দিয়ে যাব।"

মা গাঁইগুঁই শুরু করে দিলেন, "ওকে নিয়ে যাচ্ছেন, দেখবেন শেষটায় ভয়টয় পেয়ে কী না কাণ্ড করে বসে।"

এক বৎসর

২৬ সংখ্যার জন্য ১৮২ টাকার বদলে
এখন দিতে হবে মাত্র ১৫৫ টাকা

দুই বৎসর

৫২ সংখ্যার জন্য ৩৬৪ টাকার বদলে
এখন দিতে হবে মাত্র ৩০০ টাকা

বিদেশের গ্রাহক

বার্ষিক ২৬ সংখ্যার জন্য
৩৬ ডলার অথবা ২২ পাউন্ড

আপনি যদি গ্রাহক হতে চান তাহলে অনুগ্রহ করে আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা অবিলম্বে আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের অনুকূলে চেক অথবা ড্রাফট সহ নীচের ঠিকানায় পাঠান :

সারকুলেশন ম্যানেজার (ইউ)
আনন্দ বাজার পত্রিকা লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলিকাতা-৭০০ ০০১

কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রযোজ্য নয়

CLARION C-ABAMD-1

ব্রজদা হাসলেন, "ভয়ের কী আছে, আমার সঙ্গেই তো থাকবে।"

শেষটায় বাবা মত দিলেন, "যাক ঘুরেই আসুক। তবে জঙ্গল দেখতে বেরিয়ে তোর ব্রজদাকে বিরক্ত করবি না কিন্তু।"

আমি গুড বয়ের মতো মাথা নাড়লাম। দিদির দিকে তাকালাম।

দিদি বলল, "এর পরেরবার কিন্তু আমাকে নিয়ে যেতে হবে ব্রজদা।"

ব্রজদার চোখে হাসি, "আমি তো সব সময় বলি, তোরা চল, দেখিয়ে আনি তোদের জঙ্গলের রহস্য।"

বুকের ভেতর যেন দুন্দুভি বাজছিল। জামা-প্যান্ট সব গুছিয়ে নিতে যেটুকু সময়। রাতে ব্রজদার পাশেই শুয়ে ঘুমোলাম। উত্তেজনায় ঘুম কি আর আসতে চায়! ব্রজদা তো শুয়েই ঘোঁতঘোঁত করে নাক ডাকতে শুরু করে দিলেন। আমার চোখে কেবল বন-জঙ্গলের ছবি। তার মধ্যে নেকড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সিংহ, হাতি, গণ্ডার কত কী! আচ্ছা, জঙ্গলে তো অজগরও থাকে। ভয়ানক একটা অজগর যদি আমাদের দিকে তেড়ে আসে!

সারা গা কেমন ছমছম করে উঠল। অজগর তো গোটা একটা ছাগলকেও গিলে ফেলতে পারে, আর মানুষকে গিলতে কতক্ষণ!

ভাবলাম, একবার ব্রজদাকে ডাকি। জিজ্ঞেস করি। কিন্তু না, ডাকতে সাহস হল না। ব্রজদা ঘুমোচ্ছেন। ডাকলে হয়তো রেগে গিয়ে বলবেন, না, তোকে যেতে হবে না, ভিতু কোথাকার!

আবার বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়লাম। তারপর আরও বেশ কিছুক্ষণ ছটফট করে শেষটায় কখন যেন ঘুমিয়েই পড়েছিলাম।

ঘুম ভাঙল বেশ বেলায়। দেখি, ব্রজদার ততক্ষণে দাড়ি কামানো শেষ।

"কী রে, ঘুম ভাঙল?"

একটু লজ্জা পেয়ে উঠে বসলাম তড়াক করে।

"যা, হাতমুখ ধুয়ে চানটান করবি তো, করে নে। আমরা কিন্তু ন'টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়ব।"

"আপনি চান করবেন না?"

"দুপুরে কোথাও করে নেব। যা, তুই রেডি হয়ে নে। আমার জন্য তোকে ভাবতে হবে না।"

বাবা আমাকে অনেক উপদেশ দিলেন, "জঙ্গলে গিয়ে একদম দুষ্টুমি করবি না বলে দিচ্ছি। ব্রজবাবুর সঙ্গে-সঙ্গে থাকবি। ব্রজবাবু যেভাবে তোকে থাকতে বলবেন সেভাবে থাকবি। বুঝলি?"

আমার মতো অত গুড বয় তখন আর কেউ নেই।

দিদি বলল, "পারলে একটা হাতির বাচ্চা কোলে করে নিয়ে আসিস মন্টু, বুঝলি?" বলেই খিলখিল করে হেসে উঠল।

ওদিকে মা তখন রান্নাঘরে। আমাদের জন্য লুচি আর মাংস টিফিন ক্যারিয়ারে প্যাক করছেন। জঙ্গলে গিয়ে আমরা ঠিকমতো খাওয়ার পাব কি না তাই কেবল মা'র চিন্তা।

যাই হোক, সব কিছু গোছগাছ করে নিয়ে বেরোতে-বেরোতে প্রায় দশটা বেজে গেল। গটমট করে জিপে উঠে ব্রজদার পাশে বসে পড়লাম। তারপর গাড়ি স্টার্ট করতেই হাত নেড়ে বিদায় জানালাম, "টা-টা।"

ব্রজদার হাতে স্টিয়ারিং, মুখে চুরুট। ন্যাশনাল হাইওয়েতে পড়েই গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দিলেন। চারপাশের চেনা বাড়িঘর মানুষজন ধীরে-ধীরে সব হারিয়ে যেতে লাগল।

ব্রজদা বললেন, "ঠিকঠাক মতো যদি এগনো যায় তা হলে বিকেল চারটা-পাঁচটার মধ্যেই আমরা নন্দনবনে পৌঁছে যাব। বুঝলি, সন্ধের আগে পৌঁছতে না পারলেই ঝামেলা।"

"কেন, ঝামেলা কেন?" বুকের ভেতর কেমন ঢিপ করে ওঠে।

"ঝামেলা মানে, বাংলোর চৌকিদারগুলো সন্ধে হতে-না-হতেই গেটে তালা লাগিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। তখন ওদের ডাকাডাকি করে তোলো, এইসব আর কি!"

আমি তাকিয়ে থাকি।

"তা ছাড়া বুঝলি, একবার সে এক দারুণ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। মধ্যপ্রদেশের একটা জঙ্গলে দু' দিন কাটাব বলে একটা গাড়ি ভাড়া করে রওনা দিলাম। কপালে দুঃখ ছিল, জঙ্গলের কাছাকাছি এসে গাড়ি বিগড়োল। ঘড়িতে তখন বিকেল প্রায় পাঁচটা। ড্রাইভার আমারও অজানা নয়, আমিও হাত লাগালাম। কিন্তু গাড়ির হাজার ঝামেলা, একটা সামাল দিই তো আর-একটা গোলমাল ধরা পড়ে। শেষটায় রাত প্রায় আটটার সময় গাড়ি আবার স্টার্ট নিল। ভাবলাম, যাক বাবা, আর আধঘণ্টার মধ্যেই বাংলোয় পৌঁছনো যাবে। কিন্তু..."

"কী কিন্তু?"

ব্রজদা হাসলেন, "খানিক দূর এগিয়েই দেখি রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে একপাল হাতি। বিশাল-বিশাল চেহারা। ড্রাইভার গাড়ি থামাল। হর্ন বাজাল বেশ কয়েকবার। কিন্তু হাতিগুলো নির্বিকার। রাস্তা ছেড়ে সরে যাওয়া তো দূরের কথা, মনে হল যেন গাড়িটাকে আক্রমণ করার জন্য তৈরি হচ্ছে।

"গাড়ির ড্রাইভার তো ভয়ে কাঁপতে শুরু করেছে। বললাম, 'তুমি এদিকে এসো। স্টিয়ারিং আমাকে দাও দেখি!'

"তাই হল। আমি স্টিয়ারিং হাতে নিলাম। গাড়ির ফ্লাড লাইট নিভিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। চোখ আমাদের হাতিগুলোর দিকে।

"কতক্ষণ যে ওভাবে বসে ছিলাম বলতে পারব না, একসময় দেখি, হাতিগুলো খুব ধীরে-ধীরে সামনের দিকে এগোতে শুরু করেছে। সর্বনাশ। গাড়ির ওপর হামলা চালাবে নাকি রে বাবা! হাতিগুলোর যা চেহারা, গাড়িটা তো ওদের কাছে খেলনার মতো।

"ওদিকে ড্রাইভার-ছোকরা তো ভয়েই কেমন গোঁ-গোঁ শুরু করেছে। আমি ধমকে উঠলাম, 'চোপ! একদম শব্দ করবে না বলে দিচ্ছি।'

"হাতিগুলো দু'-পা এক-পা করে এগোতে লাগল। গাড়িটাকে কোনওরকমে যে ব্যাক করে নিয়ে পালাব সে উপায় নেই। সামনের দিকে কেবল তাকিয়ে রইলাম। হাতিগুলো এগোতে-এগোতে প্রায় হাত দশেকের মধ্যে চলে এল। তা হোক, আমি ঘাবড়াবার পাত্র নই। যা থাকে কপালে, ধক করে ফ্লাড লাইট জ্বালিয়ে হর্ন চেপে ধরে রাখলাম। গাড়ির হর্নে সারা জঙ্গল যেন লাফিয়ে উঠেছে। দেখি, হঠাৎ অমন শব্দ আর আলো দেখে হাতিগুলোও কেমন ঘাবড়ে গিয়ে এলোপাথাড়ি ছুটতে শুরু করেছে। সে এক অভাবনীয় দৃশ্য। হাতিগুলো যে অমনভাবে প্রাণের ভয়ে পালাতে পারে সে দৃশ্য চোখে না দেখলে কেউ বিশ্বাসই করবে না।

"তা বুঝলি, মিনিট কয়েকের মধ্যেই সামনের রাস্তা একেবারে পরিষ্কার। সঙ্গে-সঙ্গে ফুল স্পিডে গাড়ি হাঁকিয়ে বাংলোর সামনে যখন এলাম, তখন বেশ রাত। চারপাশে গভীর জঙ্গল একেবারে নিস্তব্ধ।

"গাড়ি থেকে নেমে বাংলোর গেটের কাছে এসে দেখি, তালা বন্ধ। চিৎকার শুরু করে দিলাম, 'চৌকিদার, চৌকিদার।' কিন্তু কে শোনে সে কথা। চৌকিদার হয়তো নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে। গাড়ির হর্ন বাজালাম বেশ কয়েকবার কিন্তু ওদিক থেকে কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

"শেষটায় বুঝলি, গেট ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকে চৌকিদারকে ডেকে তুলতে হয়েছিল। সেঃ এক কাণ্ড বটে।"

ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে জিপ শাঁ-শাঁ করে ছুটে চলেছে। জিপ চালাতে-চালাতেই ব্রজদা চুরুটটা আবার ধরিয়ে নিলেন। তারপর একটু হাসলেন, "নন্দনবনে অবশ্য এর আগেও কয়েকবার আমি গেছি। চৌকিদার আমার খুব চেনা লোক। তবু বুঝলি না,··· ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের চৌকিদাররা সবাই প্রায় একরকম। রাত হয়ে গেলেই আর ওদের টিকি পাওয়া মুশকিল।"

আমি চুপ করেই ছিলাম। সারা শরীরে কেমন একটা উত্তেজনা গড়াচ্ছিল। রাস্তার দু'ধারে তখন সবুজ ধানখেত। বহু দূরে-দূরে গ্রাম। কখনও-বা নানারকম পাখপাখালি উড়ে যাচ্ছে। দেখে-দেখে যেন আশ মিটছিল না।

ব্রজদা ঘাড় ফিরিয়ে একবার আমার দিকে তাকালেন, "কী রে, চুপ করে গেলি যে!"

আমি চমকে উঠেছিলাম, "না না, চুপ কোথায়?"

"বুঝেছি, তোর খিদে পেয়েছে। দাঁড়া, আর খানিকটা এগিয়ে লুচি-মাংস সেঁটে নিতে হবে। তোর মা কিন্তু মাংসটা ভালই রান্না করে।"

ব্রজদা বেশ ভোজন-বিলাসী মানুষ। বললাম, "আপনি খেয়ে নিন না। প্রচুর মাংস আছে। দরকার হলে রাতের জন্যও রেখে দেওয়া যাবে।"

ব্রজদা হাসলেন, "রাতের জন্য রাখবি কী রে! রাতে চৌকিদার কেমন মুরগি রান্না করে দেখিস।"

দূরে খানিকটা জায়গা জুড়ে মাঠের মধ্যে বেশ বড়-বড় কয়েকটা গাছ। ছায়া বিছনো। গাড়িটা সেদিকেই নিয়ে যাচ্ছিলেন ব্রজদা। হঠাৎ দুম করে বিকট একটা শব্দ।

আকাশে ওড়ার কথা □ উনত্রিশ

ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯১৮ : হ্যান্ডলি পেজ ভি-১৫০০

বোমারু বিমানটি অনেক দিকথেকে উল্লেখযোগ্য। এটিই প্রথম চার এঞ্জিনযুক্ত ব্রিটিশ বিমান, তৈরি হয়েছিল দূরপাল্লার বোমারু হিসেবে বার্লিনের ওপর বোমা বর্ষণের জন্য। যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে পর্যন্ত মাত্র তিনটি বিমান তৈরি হয়েছিল কিন্তু সেগুলি যুদ্ধে অংশ নিতে পারেনি।

যুদ্ধের পর ইউরোপ থেকে ভারতে বিমান সার্ভিস চালানোর জন্য একটি সমীক্ষা হয়, তাতে ব্যবহৃত হয়েছিল এই বিমানটি। বিমানটিতে ছিলেন জেনারেল স্যালমণ্ড, জেনারেল বার্টন, ক্যাপ্টেন রস স্মিথ, সার্জেন্ট শায়ার্স ও সার্জেন্ট বেনেট। বিমানটি মিশরের রাজধানী কায়রো থেকে রওনা হয় ৩০ নভেম্বর ১৯১৮ তারিখে এবং দামাস্কাস, বাগদাদ, বসরা, বুশায়ার, বন্দর আব্বাস ও চাহবার হয়ে করাচি পৌঁছয় ১০ ডিসেম্বর। কায়রো থেকে প্রথম কিছু বিমান-ডাক নিয়ে আসে এই বিমান। আবার করাচি থেকে রওনা হয়ে বিমানটি কলকাতায় আসে নাসিরাবাদ, দিল্লি ও এলাহাবাদ হয়ে। মঙ্গলবার ১৭ ডিসেম্বর সকালে হ্যান্ডলি পেজ বিমানটি এলাহাবাদ থেকে রওনা হয় ও ৬ ঘণ্টা ৪০ মিনিট ওড়ার পর কলকাতার রেসকোর্সে নামে সেইদিন বেলা

পৌনে তিনটেয়। নামবার সময়ে রেসকোর্সের সার্পেন্টাইন ট্যাঙ্কে একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে এর ডান দিকের ডানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রেসকোর্সে বিশেষভাবে সাজানো একটি শামিয়ানার নীচে বৈমানিকদের অভ্যর্থনা করেন বড়লাট লর্ড চেম্‌সফোর্ড, বাংলার গভর্নর লর্ড রোনাল্ডশে ও লেডি রোনাল্ডশে, অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও সামরিক বাহিনীর কর্মচারীরা। জেনারেল স্যালমণ্ড সবাইকে বিমানটি ঘুরিয়ে দেখান ও কায়রো থেকে কলকাতা আসার পথের বিবরণ দেন। ওড়াপথের দূরত্ব ৪,০৮৮ মাইল অতিক্রম করতে তাঁদের সময় লেগেছে ৫৯ ঘণ্টা ১১ মিনিট। জেনারেল বলেন, চাহবার থেকে এক অনাহূত যাত্রী ওঠে, একটি ইঁদুর, ধরা পড়ার আগে সে বিমানের কিছু তার কেটে দেয়। এটিই হল কলকাতায় আসা প্রথম দূরপাল্লার বিমান।

বিমানের বিশদ বিবরণ :

নির্মাতা : হ্যান্ডলি পেজ লিমিটেড, ইংল্যান্ড।

লম্বায় : ৬৪ ফুট বা ১৯·৫১ মিঃ।

ডানার আয়তন : ১২৬ ফুট বা ৩৮·৪০ মি·।

বৈমানিক ও যাত্রী : ৫ জন।

গতিবেগ : ঘন্টায় ৯০ মাইল বা ১৪৬ কি· মি·।

অস্ত্রসম্ভার : ৬টি মেশিনগান ও ৩০টি ২৫০ পাউন্ড বা দুটি ৩,৩০০ পাউন্ড বোমা।

একটানা ওড়ার ক্ষমতা : কিঞ্চিদধিক ৬ ঘণ্টা।

এঞ্জিন : চারটি ৩৭৫ অশ্বশক্তির।

"কী হল ?"

ব্রজদা গাড়ি থামালেন, "পাংচার।"

আমার বুক শুকিয়ে উঠেছিল, "তা হলে ?"

"কী তা হলে !" ব্রজদা গাড়ি থেকে নামলেন, "চাকা পালটাতে আর কতক্ষণ লাগবে। দ্যাখ না, এক্ষুনি পালটে ফেলছি চাকাটা।"

গাড়ি থেকে আমিও নামলাম। চারপাশে এখন অচেনা পৃথিবী। এ পৃথিবীর সঙ্গে কোনওদিনই আমার পরিচয় ছিল না। কী ভাল যে লাগছিল জায়গাটা তা বলে বোঝানো যাবে না।

কপালে দুঃখ থাকলে যা হয় আমাদের তাই হল। নন্দনবনের জঙ্গলে যখন ঢুকলাম, তখন ঘড়িতে প্রায় আটটা। আটটাই যেন গভীর রাত। সারা জঙ্গল জুড়ে চাঁদের আলোর আলপনা গড়াচ্ছে। কেমন একটা নিস্তব্ধতা।

ব্রজদা বললেন, "দু-দুবার পাংচার হলে দেরি তো হবেই। তারপর আবার একবাটি মাংস খেয়ে উঠতে একটু সময় নষ্ট হল, তাই না ?"

আমি বোকার মতো তাকিয়ে থাকি।

ব্রজদা আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন, "ভয় পাস না মণ্টু। ওই দ্যাখ, বাংলো দেখা যাচ্ছে।"

আমারও চোখে পড়ল, লাল করোগেটেড শিটের চালওলা একটা বাড়ি। চাঁদের আলোয় যেন ভিজে রয়েছে।

ব্রজদা গাড়িটাকে গেটের কাছে এনে দাঁড় করালেন। এবার আরও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বাড়িটাকে। বাড়ির বারান্দায় খানকয়েক বেতের চেয়ার। সামনেই ঘাসের সবুজ লন। চারপাশে হাজার রকমের লিলি ফুটে আছে। কিন্তু বাড়িতে কোনও লোকজন আছে বলে মনে হল না।

জিপ থেকে ব্রজদা নামলেন। হাতের চুরুটটা যে কখন নিভে গেছে খেয়ালই নেই। আমার দিকে একবার তাকালেন, "কী রে, ভাল নয় জায়গাটা ? চারপাশে গভীর জঙ্গল, তার মধ্যে এরকম একটা বাড়ি, ভাবতে পারিস ?"

আমার কেমন ভয়-ভয় লাগছিল। কিন্তু ভয় পাওয়াটা প্রকাশ করা ঠিক হবে না। ব্রজদার কথায় সায় দিলাম, "দারুণ ভাল জায়গাটা।"

"তবে বল ! সাধে আমি জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই !"

বাঁ দিকে একটা গাছের ডালে হঠাৎ ঝটাপট একটা শব্দ হতেই আমি চমকে উঠেছিলাম।

ব্রজদা হাসলেন, "ও কিছু নয়। পাখি। হাজার-হাজার পাখি এখন গাছের ডালে আশ্রয় নিয়ে ঘুমোচ্ছে।"

ততক্ষণে বাংলোয় ঢোকার গেটের দিকে আমার চোখ পড়েছে। বললাম, "গেটে তো তালা ঝুলছে ব্রজদা ?"

"তা তো ঝুলবেই। সন্ধে হতে-না-হতেই চৌকিদার তালা লাগিয়ে দেয়। দাঁড়া, ডাকি লোকটাকে।"

ডাকি মানে, গলা তুলে ডাকা নয়। জিপের হর্ন বাজালেন ব্রজদা। পরপর তিনবার। আর সেই কর্কশ শব্দে যেন সমস্ত বনভূমি চমকে-চমকে উঠল। ভাবখানা এরকম, যেন কী আপদ রে বাবা, এত রাতে আবার কে জ্বালাতন করে ! একটু নিশ্চিন্তেও থাকতে দেবে না দেখছি।

বাংলোর চারপাশে ঘন কাঁটাতারের বেড়া। বেশ উঁচু। নীচের দিকে ফুট তিন-চারেকের মতো উঁচু কংক্রিটের দেওয়াল। সাদা রং করা। বাইরে থেকে কারও পক্ষেই এই দেওয়াল আর বেড়া ভেদ করে ভেতরে ঢোকা সম্ভব নয়। তা সে বাঘই হোক, আর যে কেউই হোক।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

শব্দসন্ধান ▬ রঞ্জন

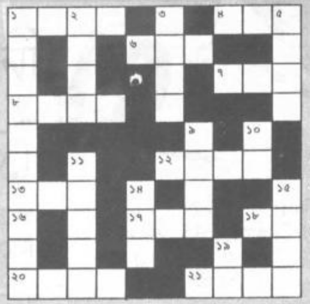

এবারের শব্দসন্ধান বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে। বিশ্বকাপ ফুটবলের বিদেশী নামধাম বাংলা শব্দছকে মেলানো খুবই দুরূহ ব্যাপার। বাংলায় 'রাইকার্ড' না 'রিচকার্ড' ? পত্রপত্রিকায় দু'রকমই লেখা হচ্ছে। তবু বিশ্বকাপের বিশ্বব্যাপী উন্মাদনায় শামিল হয়ে একটা ··কিছু দাঁড় করানো গেল।

সংকেত : পাশাপাশি : (১) লাতিন আমেরিকার এই খেলোয়াড় কলকাতার নেহরু কাপেও মাতিয়ে রেখে গেছেন। বিশ্বকাপে এবার তাঁর দ্বিতীয় আবির্ভাব। (৪) পেলের মতে এবারে ইনিও হতে পারেন বিশ্বকাপের সুপারস্টার। (৬) ইনি 'সাদা পেলে' নামে পরিচিত ছিলেন। (৭) ব্রাজিলের মস্ত ভরসা এই ফরওয়ার্ড। (৮) রাশিয়ার এই 'ইউরোপের বর্ষসেরা' ফুটবলার গত বিশ্বকাপে সাড়া জাগিয়েছিলেন। (১২) গত বিশ্বকাপ ফাইনালে দ্বিতীয় গোলটি ইনিই করেছিলেন। (১৩) গতবার জিকোর পেনাল্টি কিক আটকে ফ্রান্সকে সেমিফাইনালে তুলে দিয়েছিলেন। (১৭) অধিকাংশ ফুটবল-বিশেষজ্ঞের মতে ইনিও হতে পারেন এবারের সুপারস্টার। (১৮) আসল নামটা বিরাট, এই নামেই 'রাজা'। (২০) ববি হলে ম্যানেজার, ব্রায়ান হলে ক্যাপ্টেন। (২১) ১৯৮২ বিশ্বকাপে দ্বিতীয় সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হন।

উপর-নীচ : (১) সবচেয়ে বেশিবার ফাইনালে উঠেছে এমন দেশের কিংবদন্তি – ক্যাপ্টেন ও কোচ। (২) হল্যান্ডের আর-এক নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়। (৩) ফাইনাল রাউন্ডে এই দেশটি প্রথম খেলল এবার। (৫) মেক্সিকো বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলদাতা। (৯) আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার রেকর্ড তৈরির লক্ষ্য নিয়ে ইতালি এসেছেন। (১০) ১৯৮২-তে বিশ্বকাপজয়ী দেশের ক্যাপ্টেন ছিলেন — জফ। (১১) ১৯৭৪ ফাইনালে ইনিই প্রথম গোল করেন, কিন্তু দেশ জেতেনি। (১৪) ইতালির সবচেয়ে দামি খেলোয়াড়ের নামের প্রথমাংশ। (১৫) ব্রাজিলের বিখ্যাত মিডফিল্ডার। (১৯) ১৯৭৪, ১৯৭৮ হল্যান্ড দলে আর-একজন 'রুদ' ছিলেন, তাঁর পরের নামটুকু কী ?

গত সংখ্যার সমাধান

জি	লি	পি	■	গো	সা	প	■	খু	নি
জ্ঞা	■	রা	জ্ঞী	■	■	নি	র	ব	ধি
সা	কি	ন	■	তু	যা	র	■	■	রা
বা	■	হা	ঙ	র	■	■	পি	দি	ম
দ	ম	■	■	পু	নে	■	ক	নে	■
■	ল	তা	■	ন	ল	■	■	শ	প
শ	য়	ন	■	■	স	ড়	ক	■	দ্ম
শ	■	■	স	দ	ন	■	বি	লা	প
ব্য	তী	হা	র	■	■	চো	গা	■	লা
স্ত	র	■	ণি	জ	স্ত	■	ন	রে	শ

টাকাকড়ি

আদিম ছাঁচে ঢালা টাকা তৈরির প্রণালী

ছাঁচে ঢালা মুদ্রা তৈরির আদিযুগের কথা লিখেছেন ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আদিমকালের ছাঁচে তৈরি মুদ্রার সঙ্গে পরবর্তীকালের ছাঁচে তৈরি মুদ্রার (যেমন কুষাণ, গুপ্ত বা মুঘল যুগের) অনেক তফাত। এ-বিষয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে টাকার বহু প্রচলনের পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এক ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সমস্যাটি জালিয়াতি সংক্রান্ত। আগেই জানিয়েছি, টাকার জালিয়াতের ব্যবহৃত জিনিসপত্রের এক তালিকা পাওয়া যায় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে। বইটির সবটাই, বা অধিকাংশ লেখা হয়েছিল মৌর্য যুগে। সুতরাং মৌর্য যুগে দেশের সরকারকে টাকার জালিয়াতের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়েছিল।

ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ছবিসমেত (কিন্তু লেখবিহীন) অনেক তামার মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। যেগুলির গায়ে ছবি টঙ্ক বা পাটা বা ছাঁচ (die) দ্বারা আহত টাকার চিত্রের মতো দাগ কেটে বসেনি এবং অনেকক্ষেত্রে অস্পষ্ট থেকে গেছে। এই পার্থক্যের কারণ দুই শ্রেণীর মুদ্রা তৈরির প্রণালীর মধ্যে প্রভেদ। মুদ্রা-যোগ্য ধাতবখণ্ডের (blank) উপরে পাটায় বা ছাঁচে উৎকীর্ণ ছবি জোর দিয়ে ছাপ মেরে আলোচ্য মুদ্রাগুলি তৈরি হয়নি। এগুলি তৈরি হয়েছিল ছাঁচে (mould) মুদ্রা-যোগ্য ধাতু গলানো অবস্থায় ঢেলে দিয়ে। ওই গলানো ধাতু শুকিয়ে কঠিন হওয়ার সময় তার গায়ে ছাঁচে উৎকীর্ণ ছবি ক্রমশ ফুটে উঠত।

ছাঁচে ঢালা মুদ্রা তৈরির আদিযুগে প্রয়োজনীয় ছবির নঞর্থক (negative) রূপ উৎকীর্ণ করা হত আগুনের তাপ সহ্য করতে পারে এমন নমনীয় মাটির সাহায্যে প্রস্তুত ছাঁচের উপরে। এই ছাঁচের উপাদানে তাপ সহ্য করবার ক্ষমতাসম্পন্ন সিলিকার (silica) গুঁড়ো মেলানোও অসম্ভব ছিল না। চৌকো বা গোল আকারের ছাঁচের কিনারায় উঁচু বেড় থাকত, যাতে এর উপরে গলানো ধাতু ঢালার সময় তা ছাঁচ থেকে গড়িয়ে পড়ে না যায়। প্রয়োজনীয় ধাতু গলিয়ে চিত্র উৎকীর্ণ ছাঁচে নির্দিষ্ট পরিমাণে ঢেলে দেওয়া হত। ধাতু শুকিয়ে ঠাণ্ডা হলে ছাঁচ ভেঙে টাকা বের করে নেওয়া হত। তাই প্রত্যেকটি মুদ্রার জন্য একটি করে ছাঁচের প্রয়োজন ছিল।

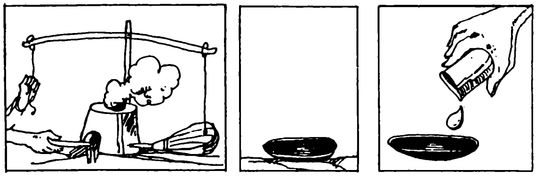

গলানো ধাতু একটি ছাঁচে ঢেলে একদিকে চিত্র সমেত মুদ্রা তৈরির প্রণালী

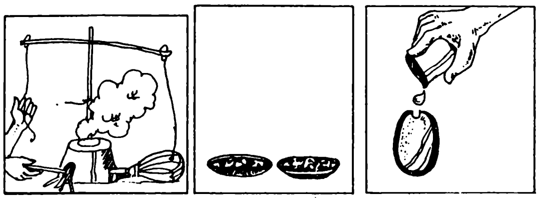

গলানো ধাতু পরস্পরযুক্ত দুটি ছাঁচে ঢেলে দু'দিকে চিত্রসমেত মুদ্রা তৈরির প্রণালী

এইভাবে তৈরি টাকার এক পাশে চিত্র থাকত। দুইদিকে ছবি ফুটিয়ে তুলতে হলে দুটি ছাঁচের ব্যবহার আবশ্যক। এক-একটি ছাঁচের গায়ে এক-একদিকের নঞর্থক রূপ উৎকীর্ণ থাকত। দুটি ছাঁচের কিনারার বেড়ে একটি অংশ অর্ধবৃত্তাকারে কাটা হত। এর পর ছাঁচ দুটিকে এমনভাবে পরস্পরের সঙ্গে লাগানো হত, যেন ওই দুটি কাটা অংশ একে অন্যর মুখোমুখি হয়ে একটা গোল ফুটোর সৃষ্টি করে। ছাঁচ দুটিকে পরস্পরের সঙ্গে ঠিকমতো আটকে রাখবার জন্য তাদের জোড়ের রেখা বরাবর কোনও নিটোল মাটির প্রলেপ দেওয়া অসম্ভব ছিল না।

এর পরে প্রয়োজনীয় ধাতু এক পাত্রে রেখে আগুনের তাপে গলিয়ে পরস্পরের সঙ্গে মুখোমুখি লাগানো ছাঁচ দুটির ফুটোর মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণের গলিত ধাতু ঢেলে দেওয়া হত। পরে ধাতু ঠাণ্ডা হয়ে কঠিন হলে ছাঁচ দুটি ভেঙে টাকা বার করে নেওয়া সম্ভবপর ছিল।

কোনও-কোনও সময় প্রয়োজনীয় মুদ্রার এক দিকের (ধরা যাক মুখ্য দিকের) এক জোড়া ছাঁচ তৈরি করে দুটির কিনারার মধ্যে একটি অর্ধবৃত্তাকার নালা বসিয়ে দেওয়া হত। এইভাবে নালাসমেত আর একদিকের (গৌণ দিকের) এক জোড়া ছাঁচ তৈরি করে নেওয়া যেত অনায়াসে। তারপর দুই জোড়া ছাঁচ পরস্পরের মুখোমুখি এমনভাবে লাগিয়ে দেওয়া হত যাতে অর্ধবৃত্তাকার নালাদুটি মিলে একটি গোল নালার সৃষ্টি করতে পারে। একটি নালায় বাইরের দিক থেকে ফুটো থাকত। এই ফুটোর মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ গলানো ধাতু ঢেলে দিলে তা নালার মধ্য দিয়ে গড়িয়ে দুই জোড়া ছাঁচের ভিতরে চলে যেত। পরে ধাতু শুকিয়ে গেলে দুই জোড়া ছাঁচ ভেঙে দুটি মুদ্রা বের করে নেওয়া যেত। এই পদ্ধতিতে একসঙ্গে দুটি মুদ্রা পাওয়া সম্ভবপর ছিল। (ক্রমশ)

ক্যাম্পাস

দুবরাজপুরের একটি স্কুল

পড়াশোনার ফাঁকে ছেলেরা কোদাল-ঝুড়ি নিয়ে মাথায় গামছা বেঁধে রাস্তাঘাট পরিষ্কার করছে, পুকুরের কচুরিপানা তুলছে, সাফ করছে নালা-নর্দমা, ঝকঝকে-তকতকে করে তুলছে স্কুল-ক্যাম্পাস। ছোট্ট কিচেন গার্ডেনে ফোটাচ্ছে হরেক রঙের বাহারি ফুল। বীরভূমের রুক্ষ মাটিতে এ-যেন এক মরূদ্যান। দুবরাজপুরের শ্রীশ্রীসারদা বিদ্যাপীঠ এরকমই একটি নজর-কাড়া স্কুল। মফস্বল শহরের ছেলেরা পড়াশোনার সঙ্গে মেতে আছে নানারকম কাজকর্মে। সম্প্রতি হাওড়া লায়ন্স ক্লাবের সঙ্গে যুগ্ম উদ্যোগে ছাত্ররা অংশ নিয়েছিল চক্ষু-অপারেশন শিবিরে। ১৯৫৭ সাল থেকে এই স্কুলে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে 'অভেদানন্দ মেলা', তাও এই

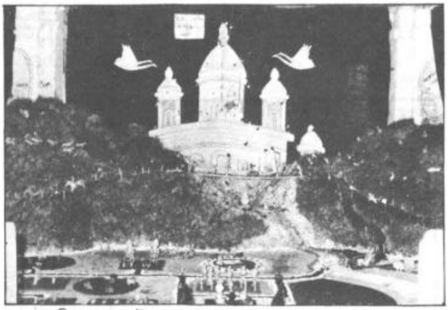

ছাত্ররা প্রতি বছর ঝুলন উৎসবের আয়োজন করে

স্কুলের ছাত্রদেরই কৃতিত্ব। প্রধানশিক্ষক ত্রিলোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সহশিক্ষক শশাঙ্কশেখর কর্মকার এবং ব্রহ্মচারী নিত্যচৈতন্য— সকলেই এ-বিষয়ে একমত। ডিসেম্বরে স্কুলের মস্ত মাঠে বসে সপ্তাহব্যাপী এই সাংস্কৃতিক মেলা। ছাত্ররা আমন্ত্রণ জানায় জেলার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের। নাচ, গান, নাটক, বিজ্ঞান ও চিত্র-প্রদর্শনী ছাড়াও থাকে নিজেদের হাতে তৈরি নানা শিল্পসম্ভার, বইপত্র। স্থানীয় যাত্রা, নাটক, কবিগান, বাউলগানের সঙ্গে মিলিত হন কলকাতার নামীদামি শিল্পীরাও। একটি শিশু সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয় এই সময়। এই সম্মেলনের সভাপতি, আলোচক, বিচারক—সবই খুদে ছাত্ররা। দোলে, ঝুলনে, সরস্বতী পুজোয়ও ছেলেরা মুখর হয়ে ওঠে আনন্দে। খেলাধুলোয়ও পিছিয়ে নেই এই স্কুলের ছাত্ররা। খেলেছে সুব্রত কাপে ; আন্তঃজেলা ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল প্রতিযোগিতায় বহুবারই দর্শকের নজর কেড়েছে। সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়, সীমান্ত মজুমদার বা বরুণ দে ফুটবল-ক্রিকেটে জেলার প্রতিনিধিত্বও করেছে। দৌড়ে (৩০০ মিটারে) দেবব্রত দত্তমুদি জেলায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। এসব খবর গর্বের সঙ্গে জানালেন ক্রীড়াশিক্ষক কল্যাণকুমার ঘোষ। যুবকল্যাণ বিভাগের বিজ্ঞান মেলায় বা বিভিন্ন বিজ্ঞান-প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ এবং পুরস্কৃত হওয়ার কৃতিত্বও কম নয়। ফটিক কবিরাজ, কুণাল পাল, দেবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কৃতিত্বের জন্য বিজ্ঞানশিক্ষক ষষ্ঠীকিঙ্কর সাহানার শ্রম ও মেধা উল্লেখ করার মতো।

প্রতিদিন ভোরবেলাই উনুনে আঁচ পড়ে যায়। বিশাল-বিশাল উনুনে চাপে মস্ত-মস্ত হাঁড়ি-কড়াই। প্রতিদিনই এক রাজসূয় যজ্ঞ যেন। বেলা বাড়তে-বাড়তে এসে পড়েন গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে দরিদ্র, ক্ষুধার্ত মানুষেরা। সারিবদ্ধভাবে অপেক্ষা করেন বিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে। হাতে তাঁদের কলাইকরা বাসন। ততক্ষণে তৈরি হয়ে গিয়েছে নরম খিচুড়ি বা ভাত-ডাল-তরকারি। ছাত্ররা প্রত্যেকে দায়িত্ব ভাগ করে নেয় রোজ। ১৫০-৫০০ জন দরিদ্রনারায়ণকে ছাত্ররা প্রতিদিন গভীর মমতায় তুলে দেয় অন্নভোগ।

গৌতম ঘোষদস্তিদার

ভারতীয়মে স্কুলের মেয়েরা

উত্তর কলকাতার আদি মহাকালী পাঠশালা একটি নামী স্কুল। বেশ বড়সড় বাড়ি, ছাত্রী-সংখ্যাও কম নয়। ভাল লাগল ছাত্রীদের শৃঙ্খলাবোধ দেখে। শুধু পড়াশুনোতেই নয়, খেলাধুলোয়ও এই স্কুলের মেয়েরা বিভিন্ন কৃতিত্ব দেখিয়েছে, স্কুলের মর্যাদা বাড়িয়েছে। সম্প্রতি সল্টলেক স্টেডিয়ামে পশ্চিমবঙ্গের স্কুলগুলিকে নিয়ে যে 'ভারতীয়ম' প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল রাজ্য সরকারের উদ্যোগে, তাতে রিদ্‌মিক জিমনাস্টিক এবং ফ্রি-প্লে প্রদর্শন করে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান জিতে এনেছে এই স্কুলের ছাত্রীরা। প্রায় ১৬৫টি স্কুল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল এবং প্রতিযোগিতার

ভারতীয়ম প্রশিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রীরা *ফোটো : শিপ্রা কর*

শেষে আদি মহাকালী পাঠশালা ও বীরভূমের কুড়ুম্বু হাই স্কুল যুগ্মভাবে বিজেতার সম্মান পায়।

জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে পিয়ালি শেঠ, সান্ত্বনা দে, সুজাতা দত্ত, অরুণিমা দে, স্বাগতা দত্ত, টিঙ্কু দাস, সোমা সাহা, শিপ্রা মণ্ডল, বৈশালী ব্যানার্জি, তনিমা পাল তাদের নানা অভিজ্ঞতার কথা শোনাল। এই কৃতিত্বের অনেকটাই অবশ্য স্কুলের ক্রীড়া-শিক্ষিকা তপতী মিত্রের প্রাপ্য। বিরাট ট্রোফি ছাড়াও এই স্কুলকে পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হচ্ছে দশ হাজার টাকা।

নীলাঞ্জন মজুমদার

লক্ষ্মীবাঈ ন্যাশনাল কলেজ অব ফিজিক্যাল এডুকেশন

শারীরশিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে ডিগ্রি এবং পোস্টগ্র্যাজুয়েট কোর্স পড়ানোর জন্য ১৯৫৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকার গোয়ালিয়রে একটি জাতীয় কলেজ স্থাপন করেন, লক্ষ্মীবাঈ ন্যাশনাল কলেজ অব ফিজিক্যাল এডুকেশন। এখানে ১৯৫৭ সালে ডিগ্রি কোর্স পড়ানো শুরু হয়, ১৯৬৩ সালে চালু হয় দু' বছরের মাস্টার ডিগ্রি কোর্স। শারীরশিক্ষায় এম. ফিল কোর্স শুরু হয় ১৯৮০ সাল থেকে। জিয়াজি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজটিকে স্বশাসিত কলেজের মর্যাদা দিয়েছেন। শারীরশিক্ষার প্রসার, গবেষণা এবং প্রশিক্ষক তৈরির জন্য এখন এই শিক্ষায়তন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছেন।

যেসব কোর্স পড়ানো হয়

(১) ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন— তিন বছরের কোর্স।
(২) মাস্টার অব ফিজিক্যাল এডুকেশন— দু' বছরের কোর্স।
(৩) কর্মরত শিক্ষার্থীদের জন্য তিন বছরের গ্রীষ্মকালীন কোর্স।
(৪) এক বছরের এম. ফিল কোর্স। সর্বোপরি গবেষণামূলক কাজের সুযোগ আছে।

কেন এসব কোর্স পড়বেন

বিভিন্ন কোর্স শেষ করার পর এখানকার স্নাতকরা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় ডিরেক্টর, সুপারভাইজার, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, লেকচারার, শারীরশিক্ষক, কোচ, রিক্রিয়েশন লিডার প্রভৃতি পদে নিয়োগের সুযোগ পেতে পারেন।

শারীরশিক্ষার উন্নতি, প্রসার এবং গবেষণার জন্য ভারত সরকার ১৯৫৭ সালে গোয়ালিয়রে স্থাপন করেন—লক্ষ্মীবাঈ ন্যাশনাল কলেজ অব ফিজিক্যাল এডুকেশন। এই কলেজের উদ্দেশ্য হল :

(১) শারীরশিক্ষা এবং খেলাধুলোয় দক্ষ কর্মী সৃষ্টি।
(২) শারীরশিক্ষা বিষয়টির উন্নতি এবং গবেষণা।
(৩) শারীরশিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানে পেশাগত এবং শিক্ষাগত কুশলতা দিয়ে সাহায্য করা।
(৪) শারীরশিক্ষায় শিক্ষণপ্রাপ্তদের কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠায় সহায়তা।
(৫) শারীরশিক্ষা এবং খেলাধুলোয় সাধারণ মানুষের উৎসাহ বাড়িয়ে তোলা।
(৬) স্কুলে শারীরশিক্ষা এবং খেলাধুলোর পাঠক্রমের প্রসার ও উন্নতিতে সাহায্য।

ক্যাম্পাস

গোয়ালিয়রের শক্তিনগরে ১৫০ একর জায়গা জুড়ে এই আবাসিক কলেজটির অবস্থান। ক্যাম্পাসের মধ্যেই থাকার জায়গা, ক্লাসরুম, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি, রিসার্চ ব্লক এবং প্রশাসনিক বিভাগ। এ ছাড়া আছে ছেলেদের জন্য ৫টি এবং মেয়েদের জন্য ১টি হস্টেল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ১টি ইনডোর সুইমিং পুল ও জিমনাশিয়াম কমপ্লেক্স, আউটডোর গেমস এবং স্পোর্টসের জন্য বিরাট খেলার মাঠ। কলেজ লাইব্রেরিটি প্রয়োজনীয় দেশী-বিদেশী বইপত্রে ঠাসা। ল্যাবরেটরিটি আধুনিক ও উন্নত সাজসরঞ্জামে সাজানো। এখানকার ছাত্রছাত্রীদের হস্টেলে থাকা বাধ্যতামূলক। খাওয়ার খরচ ছাড়া আর সব কিছুই বিনা পয়সায়। কলেজের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আছে বিনা পয়সায় চিকিৎসার ব্যবস্থা।

কতজন প্রার্থী ভর্তি করা হয়

ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন—এই কোর্সের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে মোট আসন আছে ১০০টি। ৭০ জন ছেলে এবং ৩০ জন মেয়ে নেওয়া হয়।
মাস্টার অব ফিজিক্যাল এডুকেশন— কোর্সের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে মোট আসনসংখ্যা ৪০। গ্রীষ্মকালীন কোর্সে মোট প্রার্থী নেওয়া হয় ৩০ জন। প্রাক্তন ছাত্রদের জন্য ১০টি আসন, মেয়েদের জন্য ৫টি এবং অসংরক্ষিত সাধারণ আসন মোট ১৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

১০+২ পর্যায়ে উচ্চ মাধ্যমিক, দু' বছরের প্রি-ডিগ্রি বা প্রি-ইউনিভার্সিটি বা ইন্টারমিডিয়েট কিংবা দু' বছরের ফিজিক্যাল এডুকেশনের সার্টিফিকেট কোর্সে পাশ করতে পারলে ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশনে ভর্তির জন্য আবেদন করা যায়। তবে প্রার্থীদের বয়স যেন ১৭ থেকে ২১ বছরের মধ্যে হয়। তফসিলি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উর্ধ্বতম বয়ঃসীমা ২৫ বছর।

মাস্টার অব ফিজিক্যাল এডুকেশন কোর্সে ভর্তি হতে হলে প্রার্থীর ফিজিক্যাল এডুকেশনে ব্যাচেলর ডিগ্রি থাকা চাই। তবে যাঁদের ফিজিক্যাল এডুকেশনে ১ বছরের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা আছে তাঁরাও আবেদন করতে পারবেন। তবে দুটি ক্ষেত্রেই ওইসব পরীক্ষায় কমপক্ষে শতকরা ৫০ নম্বর পেয়ে পাশ করা চাই। যেসব প্রার্থী আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছেন কিংবা যাঁরা তফসিলি প্রার্থী তাঁরা শতকরা ৪৫ নম্বর পেলেও আবেদন করতে পারেন। এই কোর্সের ক্ষেত্রে প্রার্থীর ন্যূনতম বয়স হওয়া চাই ১৯ বছর।

পড়াশোনার খরচ

ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন কোর্সে ছাত্রদের টিউশন ফি ৪৫০ টাকা, ছাত্রীদের কোনও ফি দিতে হয় না। মাস্টার অব ফিজিক্যাল এডুকেশন কোর্সে ছাত্রছাত্রীদের প্রতি সেমিস্টার পিছু জুলাই এবং ডিসেম্বর মাসে টিউশন ফি দিতে হয় ৩০০ টাকা করে। এ ছাড়া সব ছাত্রছাত্রীকেই ২০০ টাকা কশান ডিপোজিট রাখতে হয়। স্পোর্টস কিট, ব্লেজার, ক্রেস্ট ইত্যাদির খরচ বাবদ প্রথম বছরে তিন কিস্তিতে ডিগ্রি কোর্সের ছাত্রদের দিতে হয় ১০০০ টাকা। খাওয়া খরচ বাবদ সব ছাত্রছাত্রীকেই প্রতি বছর দশটি কিস্তিতে আংশিক খরচ হিসেবে দিতে হয় ১৬০০ টাকা। বর্তমানে মহিলা এবং তফসিলি ছাত্রছাত্রীদের খাওয়ার খরচও লাগে না। একজন ছাত্রকে ব্যাচেলর ডিগ্রি কোর্সের জন্য মোট দিতে হয় ৩৪০৯ টাকা ৫০ পয়সা এবং একজন ছাত্রীকে দিতে হয় ১৩৫৯ টাকা ৫০ পয়সা। মাস্টার কোর্সের ক্ষেত্রে একজন ছাত্রকে ২৫৮৯ টাকা ৫০ পয়সা এবং একজন ছাত্রীকে ৯৮৯ টাকা ৫০ পয়সা দিতে হয়। দশ সপ্তাহের সামার কোর্সে খরচ পড়ে ১৫৯৮ টাকা।

আর্থিক সহায়তা

প্রতি বছর ডিগ্রি কোর্সের দশ শতাংশ ছাত্রকে বছরে ১০০০ টাকা এবং মাস্টার কোর্সের দশ শতাংশ ছাত্রকে প্রতি সেমিস্টারে ৫৭৫ টাকা হিসেবে স্পোর্টস স্কলারশিপ দেওয়া হয়। এ ছাড়া মেরিট টিউশন ফ্রিশিপ স্কিম অনুসারে ডিগ্রি কোর্সের ৫ শতাংশ ছেলেকে ৪৫০ টাকা হারে বার্ষিক মেধাবৃত্তি দেওয়া হয়। মাস্টার কোর্সের ১০ শতাংশ ছাত্রকে দেওয়া হয় সেমিস্টার পিছু ৩০০ টাকা হারে মেরিট টিউশন ফ্রিশিপ। এজন্য পরীক্ষায় নির্দিষ্ট মানের ফলাফল প্রয়োজন। এ ছাড়া মেরিট কাম টিউশন ফ্রিশিপের ব্যবস্থাও আছে। এই স্কিমের আওতায় ডিগ্রি কোর্সের ৫ শতাংশ ছাত্র বছরে ৪৫০ টাকা অনুদান পেতে পারেন। মাস্টার অব ফিজিক্যাল এডুকেশনের ৮ জন স্নাতককে সেমিস্টার পিছু ৩৭৫ টাকা হিসেবে অনুদান দেওয়া হয়।

ভর্তির পরীক্ষা

যেসব প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা বয়স ইত্যাদি আছে তাঁদের সবাইকেই লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হয়। জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে গোয়ালিয়রে এই পরীক্ষা নেওয়া হয়। ব্যাচেলর কোর্সের ভর্তি পরীক্ষার সব প্রার্থীকে ডাক্তারি পরীক্ষা দিতে হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন টেস্টে প্রয়োজনীয় নম্বর পাওয়ার পর প্রার্থীদের মনোনীত করা হয়। মাস্টার অব ফিজিক্যাল এডুকেশন কোর্সের ভর্তির পরীক্ষায় দু' ঘন্টার লিখিত পরীক্ষা থাকে ১০০ পয়েন্টের। যে-কোনও ছাত্রকে কমপক্ষে ৪০ পয়েন্ট পেতে হবে। তেমনই খেলাধুলোর পরীক্ষায় থাকে ১০০ পয়েন্ট।

ভর্তির নিয়মকানুন

কলেজটি সহশিক্ষামূলক। সারা দেশ, এমনকী বিদেশ থেকেও ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। সব কোর্সেই মোট আসনের ২০ শতাংশ আসন তফসিলি জাতি ও উপজাতি প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। জুলাই মাসের প্রথম দিকে ইনস্টিটিউটের ছাপানো ফর্মে ভর্তির জন্য আবেদন করতে হয়। সামার কোর্সের জন্য আবেদন করতে হয় নভেম্বর মাসে। ভর্তির বিজ্ঞাপন দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। প্রাথমিকভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন সব প্রার্থীকেই ভর্তির পরীক্ষায় ডাকা হয়। কারও পরীক্ষার ফলাফল ঘোষিত না হলে সেই প্রার্থী ভর্তির পরীক্ষায় বসতে পারেন না। কম্পার্টমেন্টালে পাশ-করা প্রার্থী ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন না।

মেয়েদের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, কোনও বিবাহিতা প্রার্থী ভর্তির সুযোগ পান না। ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন কোর্স চলার সময় কারও বিয়ে হলে তাঁকে কোর্স ছেড়ে দিতে হয়। তবে মাস্টার অব ফিজিক্যাল এডুকেশন কোর্সে বিবাহিতা মহিলা ভর্তি হতে পারেন। এই কলেজে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পড়াশোনা করা হয়।

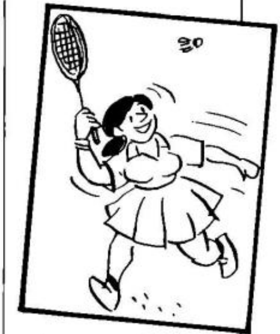

পড়াশোনার বিষয়

শারীরশিক্ষার তিন বছরের ডিগ্রি কোর্সকে পড়াশোনার সুবিধের জন্য চারটি অংশে ভাগ করে নেওয়া হয়। 'ক' অংশে থিওরি, 'খ' অংশে প্র্যাকটিক্যাল স্কিল, 'গ' অংশে টিচিং এবিলিটি (কেবল প্রথম এবং দ্বিবার্ষিক শ্রেণীতে), 'ঘ' অংশে কোচিং এবিলিটি (তৃতীয় বর্ষে)। প্র্যাকটিক্যাল স্কিল ক্ষেত্রে ছেলেদের জন্য জিমনাস্টিকস, রেস্টলিং, ক্রিকেট, বাস্কেটবল, ভলিবল, হকি, ফুটবল, জুডো, টেবিল টেনিস প্রভৃতি খেলা নির্দিষ্ট থাকে। মেয়েদের জন্য রিদমিকস এবং ফোক ডান্স, ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল, ফুটবল, হকি, টেনিস, হ্যান্ডবল, খো-খো ইত্যাদি। প্রতি বছরের পরীক্ষায় আলাদা আলাদাভাবে পাশ করা দরকার।

স্নাতকোত্তর কোর্সে, অর্থাৎ মাস্টার অব ফিজিক্যাল এডুকেশন কোর্সে ১৬টি থিওরি পেপার এবং একটি স্পেশাল পেপার।

কোথায় যোগাযোগ করবেন

সংবাদপত্রে ভর্তির বিজ্ঞাপন দেখে নিয়মাবলী এবং আবেদনপত্রের জন্য লিখবেন : ডিন অথবা ডেপুটি ডিরেক্টর, লক্ষ্মীবাঈ ন্যাশনাল কলেজ অব ফিজিক্যাল এডুকেশন, গোয়ালিয়র-৪৭৪০০২— এই ঠিকানায়।

ছবি : দেবাশিস দেব

ধারাবাহিক উপন্যাস

সোনার গণপতি হিরের চোখ

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

রুনকি-ঝুনকি হেসে বলল, "আমরা পোড়াকপালি। আমাদের কেউ নাই রে। বাবাটা অনেকদিন আগেই মরে গেছে। আর মাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে বুনো।"

শুভঙ্কর চমকে উঠল, "কী নাম বললি ? বুনো !"

"হ্যাঁ।"

"কোথায় থাকে সে ?"

"ও থাকে অনেক দূরে। ঠাকরুন-পাহাড়িতে। কিন্তু তুই অমন চমকে উঠলি কেন ? তুই চিনিস তাকে ?"

"লোকটা খুব বদ। তাই না রে ?"

"হ্যাঁ। শুনেছি কিছুদিন আগে আমার মাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছে।"

রুনকি-ঝুনকির চোখ দুটি ছলছলিয়ে উঠল।

শুভঙ্কর বলল, "ওই শয়তানটাই তো আমার সঙ্গীকে ধরে নিয়ে গেল। ওর আর-এক নাম জঙ্গল-শের।"

"হ্যাঁ, ওই শয়তানটা জঙ্গল-শেরই বটে।"

শুভঙ্কর বলল, "তোরা তো এখানেই আছিস। তোরা দেখিসনি একটু আগে একটা ভেলায় ভেসে এইখান দিয়েই চলে গেল ওরা।"

"কই দেখিনি তো ? আসলে আমরা একটু আড়ালে ছিলাম। আর আমাদের নজর ছিল জালের দিকে। তাই নজর এড়িয়ে গেছে।"

শুভঙ্কর বলল, "ওই জঙ্গল-শের কোথায় থাকে বললি ? ঠাকরুন পাহাড়িতে ? সেটা কী অনেক দূর ?"

"অনেক দূর। শুধু পাহাড় আর জঙ্গল সেখানে। দিনের আলোতেও সেখানে গেলে গা ছমছম করে।"

"আমি যাব সেখানে।"

"না, তুই যাবি না। গেলে মরবি। ওখানে গেলে কেউ ফেরে না। আমাদের মাও ফেরেনি।"

"তবু আমাকে যেতেই হবে রে। না হলে মেয়েটার কী অবস্থা হবে ?"

"মরবে। ওর আশা ছেড়ে দে তুই।"

"অসম্ভব। আমার জীবন দিয়েও ওকে আমি উদ্ধার করব। আগে এখানকার কাজটা সারি। তারপর যাব ওখানে। তোরা এখানে কতক্ষণ আছিস ?"

"তা রাত দশটা থেকেই আছি আমরা।"

"আমার একটা কাজ করবি ?"

"কী কাজ বল ?"

"যদি করিস তা হলে আমি তোদের অনেক টাকা দেব। এত কষ্ট করে রাত জেগে মাছ ধরে এই মাছ বেচে যা টাকা পাবি, তার চেয়েও অনেক বেশি টাকা আমি দেব তোদের।"

রুনকি-ঝুনকি উৎসাহিত হয়ে বলল, "সত্যি বলছিস ?"

"হ্যাঁ।"

"বেশ, তোর কাজটা আমরা করে দেব। কী করতে হবে বল ? তোকে নদীর ওপারে পৌঁছে দিতে হবে ? না অন্য কিছু ?"

"তোদের এখানে কনকদুর্গার মন্দিরটা কোথায় ? আমাকে একটু রাস্তা চিনিয়ে নিয়ে যাবি সেখানে ?"

"কনকদুর্গার মন্দির ! এমন সময় ওখানে কী করে যাবি তুই ? কেউ নেই ওখানে। ডাকু-বদমাশ কিছু হয়তো আছে ওখানে। কিন্তু ওরা তোকে দেখলেই মেরে ফেলবে।"

"ওই ডাকুগুলোর খোঁজেই তো আমাকে যেতে হবে। শিকারিবাজের নাম শুনেছিস ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ শুনেছি।"

"ওই শিকারিবাজ আমার বন্ধু বিল্টু আর তিন্নিকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে। এই জঙ্গলের মধ্যে কোথায় যে লুকিয়ে রেখেছে তাদের, তা কে জানে ? শুনেছি আজ রাতে বিল্টুকে ওরা মায়ের মন্দিরে বলি দেবে। এই খবর পেয়েই মউ নামে আমার আর-এক বোনকে নিয়েই এখানে আসছিলাম। মউ এখানকার পথঘাট চেনে। কিন্তু আমি একেবারে নতুন।"

রুনকি-ঝুনকি বলল, "তাই যদি হয় তা হলে আর গিয়ে লাভ নেই। এখন শেষ রাত। এতক্ষণে ওরা যা করবার করে ফেলেছে।"

"হয়তো। তবু একবার আমি শেষ চেষ্টা করে দেখতে চাই। তোরা আমাকে সাহায্য কর।"

রুনকি বলল, "একটু দাঁড়া। জালটা তা হলে গুটিয়ে রাখি।"

শুভঙ্কর বলল, "দেরি হয়ে যাবে। তা ছাড়া এখানে এসে কেউ তোদের জাল নিয়ে পালাবে না।"

ঝুনকি বলল, "এখানকার মানুষজনকে বিশ্বাস নেই রে। আমাদের এই মাছ ধরার জায়গাটার ওপর অনেকের নজর। তবে তুই যখন বলছিস তখন থাক। খুব সাবধানে আমাদের পিছন-পিছন আয় তুই।"

শুভঙ্কর রুনকি-ঝুনকির সঙ্গেই সেই আলোছায়ার জগতে পা টিপে-টিপে এগিয়ে চলল। সহজ-সরল এই মেয়ে দুটিকে খুব ভাল লাগল শুভঙ্করের। ওদের হাতে তির-কাঁড় আছে। ওর হাতে আছে রিভলভার। কিন্তু জলে পড়ে যাওয়ার ফলে কার্তুজগুলো তো সব ভিজে গেছে। ওগুলো আর কাজ করবে কী ? যাই হোক, বিপদে পড়লে একবার অন্তত চেষ্টা করে দেখবে।

রুনকি ও ঝুনকি যে কোথা দিয়ে কী ভাবে নিয়ে গেল ওকে তা ও বুঝতেও পারল না। তবে বেশ খানিকটা পথ যাওয়ার পর হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে ঠোঁটে তর্জনী রেখে চুপ থাকবার সঙ্কেত দিল ওরা। তারপর ইশারায় আবার যেতে বলে খুব সঙ্কীর্ণ একটি পায়ে-চলা বনপথ ধরে ওকে নিয়ে এগিয়ে চলল। এক জায়গায় ক্ষীণ একটু আলোর রেখা ওরা দেখতে পেল। আর দেখল, বনের মাঝখানে একটু উচ্চস্থানে দেবীর মন্দিরের ধ্বজা পতপত করে উড়ছে। ওরা সামনের দিকে না গিয়ে পেছন দিক দিয়ে মন্দিরের ঠিক পেছনে এসে দাঁড়াল। এখানে এসে যা দেখল তাতে সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল ওদের। ওরা দেখল সেই দুর্ভেদ্য জঙ্গলে অন্ধকার দূর করবার জন্য মন্দিরের সামনেই একটি মশাল জ্বলছে। তারই আলোয় যেটুকু আলো হয়েছে তাতেই দেখা যাচ্ছে একটি মহুয়া গাছের গুঁড়ির সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা আছে বিল্টু। ওর কান্না-ভেজা চোখ দুটোর কোল বেয়ে জলের ধারা নেমে আসছে। তার ওপর যে অমানুষিক অত্যাচার হয়েছে তারই পরিচয় সর্বাঙ্গে। মারের চোটে নাক-মুখ ফুলে গেছে ওর।

শিকারিবাজের দুই সঙ্গী রিভলভার হাতে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। ওদের একজনের নাম লক্কা, অপরজনের নাম লোটন। এরা তো শুভঙ্করের পূর্ব পরিচিত। আর মন্দিরের চাতালে একজন বিদেশী সাহেব বসে আছেন। সাহেবের নাম অ্যান্টনি।

এ ছাড়াও দু'জন ডাকাতের মতো দুর্ধর্ষ লোক বল্লম হাতে ঘোরাফেরা করছে সেখানে। ঠিক যেন জহ্লাদের মতো চেহারা তাদের। যেমন ঝাঁকড়া চুল, তেমনই পাকানো গোঁফ। বিশাল ভুঁড়ি। ভয়ঙ্কর।

শুভঙ্কর ও রুনকি-ঝুনকি চুপিসাড়ে এসে বেশ খানিকটা নিরাপদ দূরত্বে থেকে ওদের গতিবিধি লক্ষ করতে লাগল। শুধু লক্ষ করলেই তো হবে না। তাই মনের সঙ্গে দারুণভাবে বোঝাপড়া করতে লাগল, কীভাবে এই শত্রুব্যূহ ভেদ করে বিল্টুকে উদ্ধার করবে ওরা। ওরা মানে শুভঙ্কর একাই। মেয়ে দুটি তো বুদ্ধি খরচ করবে না। ওদের মারতে বললেই ওরা মারবে। লাউডগা সাপের মতো বিষাক্ত তীর ছুটে যাবে ওদের কাঁড় থেকে শিরিক-শিরিক করে। কিন্তু এই মুহূর্তে এতটুকু কাঁচা কাজ কিছু করে ফেললে সব ভেস্তে যাবে। হাতের মুঠোয় পেয়েও হারাতে হবে বিল্টুকে। তার কারণ ওরা তিনজন।

শত্রুপক্ষে পাঁচজন। ওদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র আছে। শুভঙ্করের কাছে রিভলভার থেকেও নেই। ঘন গাছপালার আড়ালে দাঁড়িয়ে আক্রমণটা কখন এবং কীভাবে হবে তাই ভাবতে লাগল। লক্কা ও লোটন কার যেন প্রতীক্ষা করতে-করতে হঠাৎই একসময় অধৈর্য হয়ে উঠল। লক্কা এসে বিল্টুর চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বলল, "এখনই নেতিয়ে পড়লে কী করে হবে ? আর-একটু অপেক্ষা কর শয়তান। শিকারিকে আসতে দে। তারপর ভোরের আগেই তোকে শেষ করে দেব।"

বিল্টু কোনও কথা না বলে যেমন ছিল তেমনই ঝিমিয়ে নেতিয়ে রইল। ঝিমোবেই বা না কেন ? সারাটা দিন কিছু খায়নি বেচারি। ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় প্রাণ ওর ওষ্ঠাগত হয়ে এসেছে। পেটের মধ্যে পাক দিচ্ছে।

লোটন বলল, "আচ্ছা, তোর জানটা কী দিয়ে তৈরি বল তো ? এত মারলাম তোকে, তবু তোর পেট থেকে একটা কথাও বের করতে পারলাম না।"

বিল্টু এবারও কোনও কথাই বলল না। ম্লান মুখে শুধু একটু হাসল।

লক্কা বলল, "আমার মনে হয় ছোঁড়াটা নিশ্চয়ই এর আগের জন্মে স্বদেশী ছিল। তাই এত কষ্ট পেয়েও মুখ খুলল না।"

"আর মুখ খোলবার দরকার নেই। রাত্রি শেষ প্রহর হতে চলেছে। শিকারিবাজ এবার আসবেই। সোনার গণপতি পাওয়া যাক বা না যাক, আজই ওর ছিন্ন মুণ্ড হয় লুটিয়ে পড়বে মাটিতে অথবা দেহটা ঝুলবে এই গাছেরই ডালে।"

যে সাহেব এতক্ষণ মন্দিরের চাতালে বসে ছিলেন তিনি এবার পায়চারি শুরু করলেন। অনেকক্ষণ এদিক-সেদিক করার পর একটা চুরুট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে বললেন, "ডেখো, হামি টোমাডের চালাকি এইবার বুঝিতে পারিয়াছে। আজ রাত্রের মধ্যে ওই মাল যদি হামি না পাবে টা হলে টোমরা আমাকে হামার সব রুপিয়া অবশ্যই ফেরট ডিবে। ইন্টারন্যাশনাল স্মাগলিং মার্কেটে হামি আর টোমাডের বিশোয়াস করিটে পারিটেছি না। যডি টোমরা আমার রুপিয়া ফেরট না ডাও টাহা হইলে টোমাডের সমূহ বিপড জানিবে।"

লক্কা, লোটন বলল, "দ্যাখো অ্যান্টনি, তুমি মিছিমিছি আমাদের ভুল বুঝছ। তোমার সঙ্গে আমাদের অনেকদিনের কাজ-কারবার। এর আগে আর কখনও এইরকম কথার খেলাপ হয়েছে কী ? তা ছাড়া তোমারথেকে যা নিয়েছি আমরা সে তো শুধু অ্যাডভান্স। মূর্তি পেলে আরও তো অনেক টাকা দিতে হবে তোমাকে।"

ক্রুদ্ধ সাহেব বললেন, "আমি আড়াই লাখ রুপিয়া টোমাডের গুনিয়া ডিয়াছে। টোমরা আমাকে ঠকাইলে আমার বস আমাকে বিশোয়াস করিবে না। আমি এখনও বলিয়া ডিটেছি, আমি ভাল মানুষ না আছে। আমার মনে হচ্ছে টোমরা একটা নাটক সাজাইয়া আমার সঙ্গে মজা করিতেছ।"

শুভঙ্কর ও রুনকি-ঝুনকি সুযোগ বুঝে একটি গাছের ডাল ধরে মন্দিরের ছাদে উঠে এসেছে তখন। যে-কোনও আক্রমণই উচ্চস্থান থেকে যতটা সহজে হয়, সামনাসামনি ততটা হয় না বলে ওরা বুদ্ধি খাটিয়ে ছাদেই উঠে এল। এখান থেকে আক্রমণ করারও সুবিধে যত, লুকিয়ে পড়াও ততই সহজ।

লক্কা, লোটন বলল, "তুমি শুধু-শুধু আমাদের ওপর রাগ করছ অ্যান্টনি।"

সাহেব এবার চুরুটটা মাটিতে ফেলে সেটাকে জুতো দিয়ে মাড়িয়ে বললেন, "ব্লাডি ফুল ! টোডের ডুইজনের বাবার নাম আমি অ্যান্টনি রাখবে। আমি টোডের জানে মারিবে।"

"তুমি ভীষণ রেগে গেছ সাহেব। কিন্তু আমাদের কী দোষ বলো। আমরা তো দলের হয়ে কাজ করি।"

"আমি কোনও কঠা শুনবে না। হয় টোমরা আমাকে হিরের চোখওয়ালা গোল্ডেন গণপতি ডিবে, না হলে আমি যে টাকা টোমাডের অ্যাডভান্স করিয়াছি, টাহা ফিরাইয়া ডিবে। আমার বস বেঞ্জামিন কালকের ফ্লাইটে চলিয়া যাইবে। টোমাডের বিশ্বাসঘাটকটার জন্য আমি টাহার কাছে মুখ ডেখাইটে পারিব না। গণপতি না পাইলে বেঞ্জামিন আমাকে গোলি করিবে। টোমরাও উহার হাট হইটে রক্ষা পাইবে না। টোমরা জানো না সে কী দারুণ ডেঞ্জারাস।"

লক্কা বলল, "জানি সাহেব। আমরা নেটিভরা খুব ভালভাবে জানি তোমরা কী লোক। আর-একটু সবুর করো তুমি। একবার শুধু শিকারিকে আসতে দাও, তারপর দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।"

(ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

আঁকিবুকি রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

চেষ্টা করে দ্যাখো

এবারেও দ্যাখো, আঁকার পাতায় মুখের গড়ন কেমন বদলে গেছে কয়েকটি রেখার টানে। তোমরা নিজেরাও চেষ্টা করে দ্যাখো না, নতুন কোনও মুখের গড়ন ফুটিয়ে তুলতে পারো কিনা !

হাসিখুশি শতদল

গতবার পরীক্ষায় খারাপ ফল করবার জন্য টুকাই তার মার কাছে খুব বকুনি খেয়েছিল। এবার রেজাল্ট বেরনোর পর টুকাই বাড়ি এল প্রায় নাচতে-নাচতে।

টুকাই : এবার আমি একশো পেয়েছি মা !

মা : কোন বিষয়ে তুমি একশো পেলে ?

টুকাই : একটিতে নয়, তিনটিতে। আমি অঙ্কে পেয়েছি চল্লিশ, হাতের লেখায় পঁয়ত্রিশ আর বাংলায় পঁচিশ।

রানা : বাবা, আমি যদি বলি

তোমার দশ টাকা বেঁচে গেল তা হলে তুমি খুশি হবে ?

বাবা : হ্যাঁ, নিশ্চয় খুশি হব, কিন্তু হঠাৎ এ-কথা কেন ?

রানা : তুমি বলেছিলে না, যদি আমি পরীক্ষায় প্রথম হই তবে তুমি আমাকে দশ টাকা দেবে। এবার আমি প্রথম হইনি।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

আহ্‌হা ! একটা মুগুর ! লোকের মাথায় মারার উপযুক্ত হাতিয়ার !
!
ডাকাতিও ! তোমার অন্য পকেটে সেই বেচারার মানিব্যাগ !
!?
বলছি,আমি নির্দোষ ! এটা চক্রান্ত । আমি যখন ঘুমিয়ে ছিলুম তখন কেউ এগুলি আমার পকেটে রেখে গেছে··· এর আগে এগুলি কখনও চোখেই দেখিনি !
আমরা আর কী করতে পারি,টিনটিন ? সব প্রমাণই তোমার বিরুদ্ধে ।
স্বীকার করছি ।
সব প্রমাণ আমার বিরুদ্ধে, এ-কথা সত্যি । আর গার্ডও শপথ নিয়ে বলতে পারে আমি পালাবার চেষ্টা করছিলুম । নিখুঁতভাবে সাজানো । কিন্তু কেন ? এবং কে করল ?
?
হাতকড়ার চাবি ! শাবাশ, কুট্টুস । ওটা এখানে নিয়ে আয় ।
ফুর্‌র্
ফুর্‌র্
এই রে , আমরা থেমে গিয়েছি··· সর্বনাশ··· টিনটিন কোথায় ?
আমি··· ইয়ে··· জানি না ।
ও সটকেছে । হাতকড়া পরেই পালিয়েছে । কী ধৃষ্টতা !
ঠিক কথাটা হবে : ও আমাদের হাতে হাতকড়া পরিয়েছে । কী ছুঁচো !

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ব্যাটম্যান
লোস মেয়েটাকে নিয়ে ব্যাটম্যান তাড়াতাড়ি চলে গেল ! সময় নষ্ট করা চলবে না !
জেন, তুমি ভাবছ ওরা ব্ল্যাকজ্যাক লুকাসের জুয়ায় জেতা লুকনো টাকার খোঁজে গেল ! এবার বুঝেছি !
মার্দি গ্রাসে এসে ব্যাটম্যান আর রবিন এক জুয়াড়ির লুকনো টাকার খোঁজে যাওয়ার সময় তাদের ওপর নজর রাখা হচ্ছে...
খানিক বাদে, ব্যাটম্যান, রবিন আর আন লেসি একটা পুরনো স্পিডবোটে মিসিসিপি নদীতে ছুটছে...
কী বললেন ? রদ্দি এঞ্জিনে এত শব্দ হচ্ছে যে, কিছুই শুনতে পাচ্ছি না !
বললাম— সামনের খাঁড়িতে ঢুকুন । 'বেটি লু'-কে ওখানেই কোথাও ফেলে রেখেছিল ।
দুম্ ! ফট !
চাগ্ ! দুম্ !
ওই যে, ওখানে !
তাসের ওপর ১৮৭৯ সালে আঁকা ব্ল্যাকজ্যাকের ম্যাপ দেখে ব্যাটম্যান টাকা লুকিয়ে রাখার জায়গা খুঁজে পেল !
ম্যাপটা ঠিক হলে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ষাট হাজার ডলার আপনার হাতে এসে যাবে ।
ভুল বললে, ব্যাটম্যান—'আমার' হাতে আসবে !
মিঃ ব্যাগলি ! সঙ্গে সেই গুণ্ডারা ! আপনিই তা হলে নাটের গুরু !
তোমাদের মোটরে এত শব্দ হচ্ছিল যে আমাদের আসা টের পাওনি !
সামলাও !
ওদের দ্যাখো, রবিন !
ব্যাটম্যান, আমি সুন্দরী মহিলার চুলের বাহার নষ্ট করতে চাই না, কিন্তু বুঝতেই পারছ ?
রবিন থামো, থামো ! মুটকু আমাদের একটু বিপদে ফেলেছে !
জলদি করো, ক্লিঙ্ক... কাজ সারা হলে ঘরে পেট্রোল ঢেলে দাও... ওদের গায়েও... আর তারপরে একটা দেশলাইকাঠি জ্বালিয়ে দাও !
কী বলছ ! অন্তত মেয়েটিকে ছেড়ে দাও !
ব্যাটম্যান, মামলা যেখানে ষাট হাজার ডলারের সেখানে আমি বিবেকহীন ! ক্লিঙ্ক, জলদি পেট্রোল ঢালো... ততক্ষণ আমরা লুঠের মাল তুলে ফেলি !
আজ রাতে ভাই দারুণ মজা জমে উঠবে শহরে...

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ধারাবাহিক উপন্যাস

উদাসী রাজকুমার

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে এসেছে। আকাশে ভাল্লুকের গায়ের মতন মেঘ। ছায়া পড়েছে চতুর্দিকে। মাঝে-মাঝে গুরু-গুরু গর্জন হচ্ছে, আর চড়াৎ-চড়াৎ করে বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে সারা আকাশ জুড়ে। জোরালো বাতাসে দুলে উঠছে গাছগুলোর মাথা। ঝড়-বাদল শুরু হতে আর দেরি নেই।

একটা ঝাঁকড়া গাছের নীচে শুয়ে আছে রাজকুমার তীক্ষ্ণ।

তাকে ঘিরে বসে আছে মল্লপাল আর অন্য সঙ্গীরা। সবাই খুব চিন্তিত। রাজকুমার অনেকক্ষণ ধরে ঘুমিয়ে আছে। দুপুরে কিছু খায়নি। ডাকলেও সাড়া দিচ্ছে না। এরকম আগে কখনও হয়নি। একটা দেশে দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয়ী হওয়ার পরেই রাজকুমার বলেছে, চলো অন্য রাজ্যে। মহাবীর রাজকুমার তীক্ষ্ণ দুপুরবেলা এরকম ভাবে খোলা মাঠে শুয়ে ঘুমোবে। এ যেন কল্পনাই করা যায় না।

ঘুমন্ত রাজকুমারের মুখখানি দেখলে মনে হয়, সে খুব ক্লান্ত। অনেকদিন তার ভাল করে ঘুম হয়নি। আজ সে সব ঘুম পুষিয়ে নিচ্ছে।

আর-একবার খুব জোরে মেঘের গর্জন হল। বাতাসের বেগ বেড়েছে। আর এভাবে মাঠের মধ্যে থাকা নিরাপদ নয়।

মল্লপাল এবার ব্যাকুলভাবে ডাকল, "কুমার! কুমার!"

রাজকুমার তীক্ষ্ণ তাতেও সাড়া দিল না। তার ঘুম এতই গভীর যে, সে মেঘের গর্জনও শুনতে পাচ্ছে না।

রাজা আর রাজকুমারদের গায়ে হাত দিয়ে ঠ্যালা মেরে ডাকার নিয়ম নেই। মল্লপালেরা কেউ রাজকুমার তীক্ষ্ণর গায়ে হাত দেওয়ার সাহস পাচ্ছে না। কিন্তু ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কায় তারা চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ জোর হাওয়ায় গাছের একটা শুকনো পাতা খসে পড়ল রাজকুমার তীক্ষ্ণর বুকের ওপর। ওইটুকু ছোঁয়াতেই সে চোখ মেলল এবং ধড়মড় করে উঠে বসল।

মল্লপাল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, "রাজকুমার, চলুন, চলুন, শিবিরে চলুন। এক্ষুনি মহা দুর্যোগ শুরু হবে।"

রাজকুমার তীক্ষ্ণ একবার আকাশের দিকে তাকাল। তারপর মল্লপালের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "সেই সন্ন্যাসী? তিনি কে? কোথায় গেলেন?"

রাজকুমার এর আগেও এই প্রশ্ন অনেকবার করেছে। কিন্তু মল্লপালরা কেউ ওই সন্ন্যাসীকে আগে দেখেনি। রাজকুমার তীক্ষ্ণ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়ার পর তিনি তাকে কোলে তুলে এনে গাছতলায় শুইয়ে দিলেন, মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন খানিকক্ষণ। তারপর চলে গেলেন। কারও সঙ্গেই আর কোনও কথা বলেননি। ওঁর সঙ্গে আরও দশ-বারোজন লোক ছিল, সবাই মিলে একটা নৌকোয় চড়ে চলে গেছে নদীর অন্য পারে।

রাজকুমার তীক্ষ্ণ বলল, "ওই সন্ন্যাসী কে, ওঁর নাম কী আমাকে জানতেই হবে।"

মল্লপাল এক ভাণ্ড দুধ সামনে তুলে বলল, "এই দুধটুকু খেয়ে নিন, কুমার! সারাদিন আপনি কিছু খাননি।"

রাজকুমার তীক্ষ্ণ তাতে আপত্তি জানাল না। এক চুমুকেই সবটা দুধ খেয়ে ফেলল, তারপর ভাণ্ডটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, "জয়পাল, ওই সন্ন্যাসীর মতন এমন সাহসী মানুষ তুমি আর কখনও দেখেছ? পাগলটার সঙ্গে লড়াই করতে করতে আমার সাঙ্ঘাতিক মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। রাগে আমার শরীর কাঁপছিল, সেই অবস্থায় সন্ন্যাসী এসে আমায় বাধা দিলেন। আমার হাতে তলোয়ার, আমি রাগের চোটে ওঁকেই আঘাত করতে পারতাম। উনি তবু ভয় পেলেন না। আমার দিকে এগিয়ে এলেন!"

জয়পাল বলল, "সন্ন্যাসীদের প্রাণের ভয় থাকে না। ভগবান তাঁদের রক্ষা করেন!"

রাজকুমার তীক্ষ্ণ বলল, "কিন্তু উনি তো আসল সাধু নন! নকল! উনি নিজেই বলেছেন যে উনি ব্রাহ্মণ নন! ব্রাহ্মণ না হলে কি কেউ সাধু-সন্ন্যাসী হতে পারে?"

জয়পাল বলল, "আজকাল তো অনেকেই দেখি গেরুয়া কাপড় পরে সাধু সেজে ঘুরে বেড়ায়!"

রাজকুমার তীক্ষ্ণ বলল, "তারা সব নকল। ব্রাহ্মণ ছাড়া কি কেউ বেদ পাঠ করতে পারে? কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই, সেই নকল সাধু যখন আমার মাথায় হাত রাখলেন, আমার সমস্ত শরীর যেন কীরকম হয়ে গেল। কী নরম আর ঠাণ্ডা তাঁর হাত। আমার মনটা জুড়িয়ে

যাচ্ছিল, আমি যেন কত রকম ফুলের গন্ধ পেলাম। চতুর্দিকে সুন্দর বাজনা বাজতে লাগল। আর কেউ আমাকে ছুঁয়ে দিলে তো এরকম কখনও হয়নি ?"

মল্লপাল বলল, "তা হলে বোধ হয় ওই সাধুটি জাদু জানে!"

রাজকুমার তীক্ষ্ণ বলল, "সেইজন্যই তো আমি ওই সন্ন্যাসীকে আবার দেখতে চাই। তাঁকে পরীক্ষা করে দেখতে চাই।"

মল্লপাল বলল, "এতদিন ধরে লড়াই করতে-করতে আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। হয়তো ওই সন্ন্যাসীর কোনও কৃতিত্ব নেই। অজ্ঞান হয়ে গেলে মানুষ অনেক কিছু শুনতে পায়।"

রাজকুমার তীক্ষ্ণ বলল, "লড়াই করে-করে আমি ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম ঠিকই। কিন্তু বিশ্বাস করো, ওই সন্ন্যাসী ছুঁয়ে দেওয়ার পর আমার সব ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে। শরীর খুব সতেজ লাগছে। সন্ন্যাসী কোন্ দিকে চলে গেলেন ?"

মল্লপাল বলল, "ওই নদীর অন্য পারে।"

বড়-বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামতেই মল্লপাল আবার ব্যস্ত হয়ে বলল, "চলুন, চলুন কুমার, শিবিরে চলুন। গাছতলায় বসে থাকলে মাথায় বাজ পড়তে পারে!"

উঠে দাঁড়িয়ে রাজকুমার তীক্ষ্ণ বলল, "শিবিরে যাব না, আমিও এখন নদী পার হব।"

রাজকুমার তীক্ষ্ণর তলোয়ারটা মাটিতে পড়ে আছে। অন্য সময়ে সেটা রাজকুমার তীক্ষ্ণর কোমরের খাপে ঝোলে। এখন সে তলোয়ারটার দিকে তাকিয়ে একটুক্ষণ কী যেন ভাবল। তলোয়ারটা তুলল না। হনহন করে এগিয়ে গেল নদীর দিকে।

মল্লপাল তলোয়ারটা তুলে অন্য একজন অনুচরের হাতে দিয়ে ছুটে গেল রাজকুমারের পেছনে। হাত জোড় করে কাতরভাবে বলল, "এ কী করছেন কুমার ? এখন নদীর দিকে গিয়ে কোনও লাভ নেই!"

রাজকুমার তীক্ষ্ণ বলল, "লাভ মানে কী ? আমি নদী পার হতে চাই!"

মল্লপাল বলল, "কী করে পার হবেন ? এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে কে নৌকো চালাবে ? মাঝিরা নিশ্চয়ই পালিয়েছে!"

রাজকুমার তীক্ষ্ণ বলল, "তুমি নৌকো চালাতে পারো না ?"

মল্লপাল বলল, "না, আমি জানি না। এই ঝড়-বৃষ্টিতে নদী পার হওয়া অসম্ভব। চলুন, আমরা শিবিরে ফিরি। তারপর আমি গুপ্তচর পাঠাচ্ছি। সে ওই সন্ন্যাসী সম্পর্কে সব খবর সংগ্রহ করে আনবে।"

বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছে রাজকুমারের সারা দেহ। ঘোর বৃষ্টিতে চারদিক প্রায় অন্ধকার হয়ে গেছে। নদীর দিকে তাকিয়ে রাজকুমার বুঝল, এ-সময় ওপারে যাওয়া সত্যি সম্ভব নয়। সে নিজেও নৌকো চালাতে জানে না।

সবাই মিলে দৌড়ে ফিরে এল শিবিরে।

ভিজে পোশাকে সবাই শীতে কাঁপছে ঠকঠক করে। আগুন জ্বালানো হল। একজন শুরু করে দিল রাত্তিরের রান্না। বৃষ্টি একটু কমতেই লুকাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল সেই সন্ন্যাসীর সন্ধান আনার জন্য।

রাজকুমার তীক্ষ্ণ কারও সঙ্গে কথা বলছে না। চুপ করে বসে আছে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে।

একটু পরে মল্লপাল এসে বসল তার সামনে। মাথা চুলকে কাচুমাচুভাবে বলল, "কুমার, আমি অন্যদের মুখপাত্র হয়ে এসেছি। যদি অভয় দেন তো একটা নিবেদন জানাতে চাই।"

রাজকুমার তীক্ষ্ণ মুখে কিছু না বলে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

মল্লপাল বলল, "মহারাজ মহাচূড়ামণির পুত্র আপনি, আপনি ধন্য। আপনার মতন বীর ভূ-ভারতে নেই।"

রাজকুমার তীক্ষ্ণ ভুরু তুলে বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, "কী ব্যাপার ? আমার নিজের লোকদের মুখ থেকে এরকম প্রশংসা তো আমি শুনতে চাই না! তুমি আসল কথাটা কী বলতে চাও, সেটাই তাড়াতাড়ি বলো!"

মল্লপাল বলল, "আজ আপনি যেভাবে উন্মাদ অলম্বুষকে জব্দ করলেন, তা দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে গেছি। এক সময় ভয় হয়েছিল, এবার বুঝি আপনার সুনামে একটা কলঙ্কের দাগ পড়বে। একটা মুগুর দিয়ে লড়াই করতে এসেছে একটা দৈত্যের মতন চেহারার পাগল। তার সঙ্গে কি কোনও বীরপুরুষ একলা লড়াই করতে পারে ? কিন্তু আপনি গাছের ওপর থেকে ঠিক তার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়লেন। সেই পাগলটা ভয়েই মারা যাচ্ছিল আর একটু হলে।"

রাজকুমার তীক্ষ্ণ বলল, "সে লোকটা শেষ পর্যন্ত পালিয়ে গেল।"

মল্লপাল বলল, "সে ভয়ে আর আসবে না। আপনি যখন ঘুমিয়েছিলেন, তখন রাজার দূত এসে জানিয়ে গেছে যে এই রাজ্য আপনাকে বীরশ্রেষ্ঠ হিসেবে মেনে নিয়েছে। এখানে আর কেউ আপনার সঙ্গে লড়বে না।"

রাজকুমার তীক্ষ্ণ বলল, "এর পর আমাদের আর কোন্ রাজ্যে যাওয়ার কথা ?"

মল্লপাল বলল, "এদিকে আর তো কোনও রাজ্য নেই। পাহাড়ের পর পাহাড়। এবার আমাদের ফেরার পালা।"

রাজকুমার তীক্ষ্ণ বলল, "কোন্ দিকে ফিরব ?"

মল্লপাল বলল, "সেই কথাটাই বলতে এসেছি, কুমার! আমাদের দলের সকলেরই ইচ্ছে, এবার দেশে ফিরলে হয় না ? তিন বছরেরও বেশি আমরা ঘুরছি বাইরে বাইরে। অহিছত্রপুরে স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা কে কেমন আছে কিছুই জানি না!"

রাজকুমার তীক্ষ্ণ একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "তিন বছর কেটে গেছে ?"

মল্লপাল বলল, "ঠিক তিন বৎসর পাঁচ মাস। কতদিন আমরা

আত্মীয়স্বজনদের দেখিনি। সকলেরই মন উতলা হয়ে আছে। তাই বলছিলাম, কুমার, এবার দেশে ফিরে চলুন।"

রাজকুমার তীক্ষ্ণ বলল, "গুরুদেব ছন্তী আমাকে পাঁচ বৎসর ঘুরতে বলেছিলেন, এখনও তো ফেরার সময় হয়নি!"

মল্লপাল বলল, "এত কম সময়ের মধ্যে আপনি এত রাজ্যের বীরদের যে পরাজিত করতে পারবেন, তা কি কেউ ভাবতে পেরেছিল? প্রায় পঞ্চাশটি রাজ্য আমরা ঘুরেছি। পাহাড় ডিঙিয়ে, অরণ্য ভেদ করে, মরুভূমি পার হয়ে আমরা গেছি এক-একটা রাজ্যে। এত দূরের পথ পাড়ি দিতে অন্যদের আরও বেশি সময় লাগত। তারপর এক-একটা রাজ্যে আপনি তিন-চারজনের সঙ্গেও আলাদা ভাবে লড়াই করেছেন। অন্য যে-কোনও যোদ্ধার পক্ষে এত যুদ্ধ করতে বছরের পর বছর লেগে যেত, কিন্তু আপনি বিদ্যুৎগতিতে সব কিছু সম্পন্ন করেছেন। এবার দেশে ফিরে চলুন, কুমার!"

রাজকুমার তীক্ষ্ণ একটুক্ষণ চুপ করে রইল। সে এর মধ্যে কখনও সময়ের হিসেব করেনি, কত বছর কেটে গেছে তা জানত না। এখন সে যৌবনে পৌঁছে গেছে। মুখে কোমল ঘাসের মতন দাড়ি, মাথার চুল নেমেছে ঘাড় পর্যন্ত।

দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে সে গম্ভীরভাবে বলল, "দেশে ফেরার জন্য আপনাদের মন উতলা হয়েছে। সেখানে আপনাদের আত্মীয়স্বজন আছে। কিন্তু মল্লপাল, আমার পিতা নেই, মাতা নেই। ভাই নেই, বোন নেই। কেউ নেই। শুধু আছেন গুরুদেব ছন্তী। তিনিই আমার বাবার মতন, মায়ের মতন। তাঁর আদেশ আমি অমান্য করতে পারি না। তিনি আমাকে পাঁচ বৎসর পরিভ্রমণ করতে বলেছেন, তার আগে আমি ফিরতে পারি না।"

মল্লপাল ব্যাকুলভাবে বলল, "কুমার, আপনি যদি আরও দিগ্বিজয়ে যেতে চান, তা হলে রাজধানী অহিছত্রপুরে একবার ফিরে তারপর আবার অন্যদিকে যেতে পারেন। এদিকে তো আর জয় করার মতন কোনও রাজ্য নেই। তা ছাড়া, অনেকদিন আমরা দেশের কোনও খবর পাইনি। মহারাজ ছন্তী যদি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন, তা হলে তিনি নিশ্চয়ই আপনাকে দেখলে খুশি হবেন। আপনি যুবরাজ। আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ রাজা! রাজসিংহাসন খালি পড়ে থাকলে অন্য কেউ দখল করে নেবে। আপনি একবার অন্তত ফিরে গিয়ে অবস্থাটা দেখে নিন।"

রাজকুমার তীক্ষ্ণ বলল, "আমাকে যদি প্রয়োজন হত, তা হলে গুরুদেব ছন্তী নিশ্চিত খবর পাঠাতেন। আমাকে খুঁজে পাওয়া তো শক্ত নয়। আমরা যে-সব রাজ্য পার হয়ে এসেছি, তারা সবাই আমার কথা জানে।"

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে শিবিরের দ্বারের কাছে গিয়ে রাজকুমার তীক্ষ্ণ আবার বলল, "তোমরা ফিরে যাও! তোমাদের ছুটি!"

মল্লপাল ভয় পেয়ে বলল, "এ কী বলছেন, কুমার! আপনাকে ফেলে রেখে আমরা ফিরে যাব? মহামান্য ছন্তী তা হলে আমাদের কারও ঘাড়ের ওপর কি মুণ্ডু রাখবেন?"

রাজকুমার তীক্ষ্ণ বলল, "আমি পত্র লিখে দেব। আমি জানিয়ে দেব যে আমি নিজেই তোমাদের ফিরে যেতে বলেছি! ও কে দৌড়ে আসছে?"

মল্লপাল দ্বারের কাছে এসে অন্ধকারের মধ্যে ছুটন্ত একটা মূর্তিকে একটুখানি দেখেই বলল, "ওই তো লুকা। নিশ্চয়ই কোনও খবর পেয়েছে।"

হাঁপাতে হাঁপাতে লুকা এসে পৌঁছে গেল শিবিরের কাছে।

রাজকুমার তীক্ষ্ণ ধৈর্য ধরতে পারছিল না। তবু সে লুকাকে দম নেওয়ার সময় দিল।

রাজকুমার তীক্ষ্ণকে প্রণাম জানিয়ে, সামনে হাঁটু গেড়ে বসে লুকা বলল, "খবর এনেছি, যুবরাজ। খেয়া নৌকোর মাঝিদের দেখা পেলাম। তারাই জানাল। তারাই ওই সন্ন্যাসীর দলকে নদী পার করে দিয়েছে। সন্ন্যাসী তাঁর দল নিয়ে বৈশালীর দিকে গেছে।"

রাজকুমার তীক্ষ্ণ জিজ্ঞেস করল, "ওই সন্ন্যাসী কে? কী তাঁর পরিচয়?"

লুকা বলল, "ওই সন্ন্যাসী নাকি আপনারই মতন বিভিন্ন রাজ্যে-রাজ্যে ঘুরে বেড়ান। মানুষকে জয় করেন। তবে কী অস্ত্র দিয়ে তিনি লড়াই করেন। তা কেউ বলতে পারল না। তবে বহু লোকই ওঁর কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছে।"

রাজকুমার তীক্ষ্ণ বলল, "সন্ন্যাসী আবার লড়াই করবে কী? ওঁর কাছে কোনও অস্ত্রও ছিল না। তা ছাড়া উনি যে ব্রাহ্মণ নন, তা কি লোকে জানে না? ব্রাহ্মণ না হয়েও সন্ন্যাসী হলেন কী করে?"

লুকা বললেন, "আপনি ঠিকই শুনেছেন, যুবরাজ। উনি ব্রাহ্মণ নন। উনি ক্ষত্রিয়। আপনারই মতন একটি রাজ্যের রাজকুমার।"

রাজকুমার তীক্ষ্ণ বিস্ময়ে চিৎকার করে বলল, "অ্যাঁ? রাজকুমার? সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ ধরে আছে? তা হলে তো ওঁকে জয় করতেই হবে! তবে জয় না করে আমি কিছুতেই ফিরব না। লুকা, উনি কোন্ রাজ্যের রাজকুমার তা জেনে এসেছ?"

লুকা বলল, "উনি কোন্ রাজ্যের রাজকুমার তা কেউ ঠিক বলতে পারল না। বোধ করি অনেক দূরের কোনও দেশের। তবে ওঁর নামটা জেনেছি। ওঁর নাম শাক্য সিংহ। এখন সবাই বলে শাক্য মুনি!"

রাজকুমার তীক্ষ্ণ খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল।

তারপর আস্তে-আস্তে বলল, "আমি আজই বৈশালী যাব। বৃষ্টি থেমে গেছে। এখন নদী পার হতে বাধা নেই। তোমরা ফিরে যাও।"

রাজকুমার তীক্ষ্ণ বেরিয়ে এল শিবিরের বাইরে। তারপর ছুটতে লাগল নদীর দিকে। (ক্রমশ)

ছবি: কৃষ্ণেন্দু চাকী

টাট্টু ঘোড়ার রাস্তায় মোটর-সাইকেল রেস

দর্শকের চিৎকার, তীব্র রোমাঞ্চ আর উত্তেজনা।

অস্ট্রেলিয়াতেই প্রথম এই খেলার উৎপত্তি হয়েছিল। রাস্তার ওপর আলগাভাবে পোড়া কয়লা ও অন্যান্য বস্তু বা 'ডার্ট' ছড়িয়ে রেখে তারপর সেই ট্র্যাকের ওপর দিয়ে তীব্র গতিতে মোটর-সাইকেল ছুটিয়ে বেরিয়ে যাওয়া। মোটর-সাইকেলে উৎসাহী ব্যক্তিরা সেখানে টাট্টু ঘোড়া ও বাইসাইকেল চলাচলের জন্য তৈরি ছোট-ছোট, সরু রাস্তায় গাড়ির গতি বাড়ানো অভ্যাস করতেন, সেখান থেকেই এই খেলার সূচনা। সরু বাঁকের মুখে তখন প্রায়ই গাড়িগুলির মধ্যে মুখোমুখি সঙ্ঘর্ষ বাধত, 'ব্রডসাইডিং' প্রথা প্রচলনের পর এই দুর্ঘটনার হার কমে যায়। ব্রডসাইডিং কিছুই নয়, গাড়ির গতিকে হাতের মুঠোয় রেখে তীব্রগতিতে কোণ ঘেঁষে বেরিয়ে যাওয়া। আরোহীর জুতোর সঙ্গে একটি ধাতব সোল সংযুক্ত, সেটিকে আলম্ব বিন্দু হিসেবে ভর নিয়ন্ত্রণ করে সূক্ষ্মকোণে বাইকটিকে বাঁকিয়ে ট্র্যাকের ওপর 'স্কিড' করিয়ে দেওয়া হয়। বাইকের পেছনের চাকা ট্র্যাকের ওপর ছড়িয়ে রাখা পোড়া কয়লার ওপর দিয়ে যেতে-যেতে পিছলে যায়, এই বাধাটি চালককে গাড়ির স্কিড নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। গাড়ি নিরাপদে ওইসব সূক্ষ্ম বাঁক পেরিয়ে যায়।

১৯২৭ সালে ডার্ট ট্র্যাকে অভিজ্ঞ কয়েকজন অস্ট্রেলীয় এদেশে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁদের নিয়ে তখন কোনও উৎসাহ দেখানো হয়নি। ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কয়েকজন ব্রিটিশ চালক হাই বিচে অনুষ্ঠিত একটি প্রদর্শনীতে অংশ নেন। অস্ট্রেলিয়ানরা সেখানে তাঁদের দক্ষতা দেখিয়ে সবাইকে তাজ্জব করে দেন।

ব্রিটিশরাও খুব তাড়াতাড়ি ব্রডসাইডিং-এর কৌশল রপ্ত করে ফেললেন, এই খেলাও তারপর দ্রুত জনপ্রিয় হতে লাগল। ১৯৬৮ সাল নাগাদ প্রায় ত্রিশটি ট্র্যাক তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এক-একজন মোটর-সাইকেলচালক সপ্তাহে দেড়শো পাউণ্ডেরও বেশি অর্থ উপার্জন করতেন। অচিরেই শুরু হল লিগ ম্যাচ ও ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানশিপের প্রতিযোগিতা, শুরু হল টেস্ট ম্যাচ। এইসব রুদ্ধশ্বাস প্রতিযোগিতাই এই খেলার মেরুদণ্ড।

নরউইচের ব্রিটিশ সার্কিটটিকে এই খেলার একটি উল্লেখযোগ্য ট্র্যাক বলে গণ্য করা হয়। সমগ্র সার্কিট বা পথটি প্রায় ৪২৫ গজ দীর্ঘ, ঘণ্টায় ৫০ মাইলেরও বেশি বেগে এখানে মোটর-সাইকেল নিয়ে লাফ দেওয়া যায়। সার্কিট বা রাস্তার ওপরের তল আলগা, অমসৃণ করার জন্য সমস্ত পথ জুড়ে পোড়া কয়লা ছড়িয়ে রাখা হয়। অসুবিধে হল, গ্রীষ্মকালে এইসব কয়লা জমাট বেঁধে যায়। কয়লা ছাড়াও বিশ্লিষ্ট গ্র্যানাইট-চূর্ণ বা সাদা বালির মতো হালকা রঙের কোনও বস্তু এই ট্র্যাকের ওপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়। রাত্রিবেলা উজ্জ্বল আলো সেই হালকা সাদা রঙে প্রতিফলিত হয়, সৃষ্টি হয় মোটর-রেসিং-এর উপযোগী অসাধারণ এক পরিবেশ। প্রতিটি 'ইভেন্ট' শেষ হওয়ার পর যন্ত্রের সাহায্যে ডার্টগুলিকে আবার মসৃণভাবে সমস্ত রাস্তা জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। দর্শকরা নিরাপত্তা-বেড়ার বাইরে বসে এই খেলা দেখেন, সমস্ত নিরাপত্তা-বেড়াটি শক্ত, স্থিতিস্থাপক জাল দিয়ে তৈরি। প্রতিযোগিতা চলাকালীন কোনও আরোহী গাড়ি থেকে পড়ে গেলেও ছিটকে গিয়ে এই জালের ওপর পড়ে, ফলে খুব একটা আঘাত লাগার আশঙ্কা থাকে না। খেলা শুরুর নির্দেশ পাওয়া মাত্র সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো প্রতিযোগীরা বাইকে স্টার্ট দেয়, প্রত্যেকেরই লক্ষ্য, প্রথম বাঁকে অন্যদের টপকে যাওয়া। প্রথম বাঁকে এগিয়ে গেলেই চালকের পক্ষে খেলা সহজ হয়ে পড়ে, কিন্তু চাকা পিছলে গেলেই সে পিছিয়ে যায়। প্রতিযোগিতার ট্র্যাক ছোট, দর্শকরা প্রতিযোগীদের খুব কাছেই বসে থাকেন। দর্শকদের চিৎকারের সঙ্গে বাইকের এঞ্জিনের গর্জন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। মৃত্যুর সংখ্যা কম। শুধু মাঝে-মাঝে হেলমেট-পরা প্রতিযোগীরা নুড়ি, কয়লা, ছাই ভরা ডার্ট-এ বেসামাল হলে চিৎকার করে ওঠেন।

প্রশ্ন

নিল ও'ব্রায়েন

(১) কোন মনোবিজ্ঞানী প্রথম 'আই-কিউ' পরিমাপ করেছিলেন ? **অপরূপা মাহাতো**, ঝাড়গ্রাম ।
(২) পি, টি, উষার পুরো নাম কী ? **ইন্দ্রনীল দাঁ**, খণ্ডঘোষ, বর্ধমান ।
(৩) মরিশাসের রাজধানীর নাম কী ? **অর্ণব ব্যানার্জি**, সাঁওতালডিহি ।
(৪) কোন ধাতু সবচেয়ে হালকা ? **অয়ন রায়চৌধুরী**, আসানসোল ।
(৫) জাম্বিয়ার মুদ্রার নাম কী ? **সুগত ঘোষ**, বার্নপুর ।
(৬) বিশ্বের সর্বাধিক অর্থমূল্যের পুরস্কার কোনটি ? এর পরিমাণ কত ? **গৌতম পুরকায়স্থ**, কলকাতা ।
(৭) কোন খেলোয়াড় বাস্কেটবল খেলতে-খেলতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান ? **উত্তম মোদক**, পাল্লা রোড, বর্ধমান ।
(৮) কলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্র কবে উদ্বোধন হয়েছিল ? **ভাস্বতী সরকার**, কোচবিহার ।
(৯) কোন পাখির 'স্বয়ম্বর সভা' ডেকে 'বিয়ে' হয় ? **সারণি দাস**, বেহালা ।
(১০) ১৯৯০ সালের প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে দিল্লিতে প্রধান অতিথি কে ছিলেন ? **বিভু দত্ত চৌধুরী**, রানিহাট, কটক ।
(১১) শেক্সপিয়রের লেখা সর্বশেষ নাটকটির নাম কী ? **বিপাশা ও রাজা চক্রবর্তী**, বর্ধমান ।
(১২) কোন দেশে নারীদের বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে হয় ? **কৃষ্ণা ঘোষ**, ঝাড়গ্রাম ।
(১৩) বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম সবাক চিত্রের নাম কী ? **শঙ্কর পাল**, চন্দননগর ।
(১৪) নেপালের বর্তমান রাষ্ট্রপতির নাম কী ? **সোমদেব মণ্ডল**, শান্তিপুর, নদীয়া ।
(১৫) ১৯৮৯ সালে কে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ? **চন্দ্রাণী সামন্ত**, বেলঘরিয়া ।
(১৬) ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান কে নির্মাণ করেছিলেন ? **শুভশ্রী ও শুভদীপ্ত মুখার্জি**, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর ।
(১৭) কোন ভারতীয় চলচ্চিত্রাভিনেতা স্টিভেন স্পিলবার্গ পরিচালিত ছবিতে অভিনয় করেছেন ? **দেবলীনা রায়**, বিধাননগর ।
(১৮) বিটল্‌স-দলের একজন গায়ক আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছিলেন । বেঁচে থাকলে ১৯৯০ সালে তাঁর বয়স হত পঞ্চাশ বছর । ওই গায়কের নাম কী ? **ডালিয়া ঘোষ**, ত্রিপুরা ।
(১৯) ভিটামিন এইচ-এর অন্য আর-একটি নাম কী ? **অভিজিৎ নন্দী**, নৈহাটি ।
(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার উত্তর

(১) জাভা ট্রেঞ্চ— ৭৭২৫ মিটার ।
(২) ঈশ্বর জানেন ।
(৩) ইন্টারন্যাশনাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট (ম্যানিলাতে অবস্থিত) ।
(৪) অ্যাগনেস গোনশা বোজাকশিম ।
(৫) বেবাদল খাঁ ।
(৬) জর্জ হার্বার্ট ওয়াকার বুশ ।
(৭) স্পেনের ইগনাসিয়াস এসকুডে (১০টি) ।
(৮) জাপানি ভাষায় 'বন' শব্দের অর্থ পাত্র ও 'সাই' মানে গাছ লাগানো । 'বনসাই' মানে পাত্রে গাছ লাগানো ।
(৯) ডঃ রাজা রামান্না ।
(১০) ফিলজফিক ন্যাচারালিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা ।
(১১) অপারেশন ফ্লাডলাইট ।
(১২) ম্যাগনেশিয়া অঞ্চলে ।
(১৩) ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি ।
(১৪) কলাইকুণ্ডা ।
(১৫) রজার ব্যানিস্টার ।
(১৬) রেণুকা ইসরানি ।
(১৭) সিনাবার HgS.
(১৮) ১৮৭৬ সালে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে প্রথম ক্রিকেট টেস্ট খেলা শুরু হয় ।
(১৯) রাসবিহারী বসু ।
(২০) অস্ট্রেলিয়ার সাইমন ও'ডোনেল (১৮ বলে) ।

রাজা রামান্না

মাদার টেরিজা

জর্জ বুশ

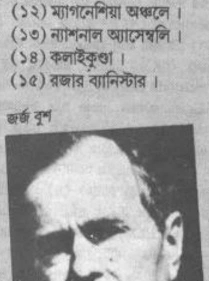

চিমা ওকেরি

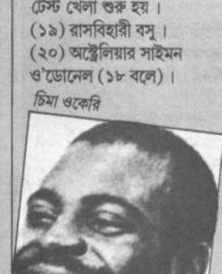

বিষয় : স্ক্যান্ডিনেভিয়া

(ক)

(খ)

(গ)

প্রশ্ন

(ক) স্ক্যান্ডিনেভীয় খামারগুলিতে গৃহপালিত পশু হিসেবে এই প্রাণীটির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। এর নাম কী ?
(খ) একটি রেল-স্টেশনের প্রধান ফটক। কোন স্টেশন ?
(গ) স্ক্যান্ডিনেভিয়ার ছেলেমেয়েরা বরফের ওপর কাঠের চেয়ার নিয়ে স্কি-জাতীয় এই খেলাটি খেলে। খেলাটির নাম কী ?

ছবির পরিচয় : (ক) বল্গা হরিণ। (খ) হেলসিঙ্কি রেল-স্টেশন। (গ) স্পার্কস্টিং।

প্রশ্ন

(১) স্ক্যান্ডিনেভিয়া বলতে কী বোঝায় ?
(২) নরওয়ের বিখ্যাত অভিযাত্রী থর হেয়ারডাল বালসা কাঠে তৈরি এক ভেলায় সমুদ্রপাড়ি দিয়েছিলেন। সেই ভেলার নাম কী ছিল ?
(৩) স্ক্যান্ডিনেভিয়ার কোন শহরকে 'উত্তরের ভেনিস' বলা হয় ?
(৪) কোন শহরে বিশ্ববিখ্যাত 'ভলভো' গাড়ি তৈরি হয় ?
(৫) ভারতবর্ষে যেমন রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য লেখা হয়েছিল, গ্রিসে যেমন লেখা হয়েছিল ইলিয়াড, ওডিসি···ফিনল্যান্ডেও সেরকম একটি বিখ্যাত মহাকাব্য লেখা হয়েছিল। এই মহাকাব্যটির নাম কী ?
(৬) 'সার্তসি' কাকে বলা হয় ?
(৭) আইসল্যান্ডের রাজধানীর নাম রিকিয়াভিক। 'রিকিয়াভিক' শব্দটির অর্থ কী ?
(৮) আইসল্যান্ডে ইউরোপের বৃহত্তম হিমবাহটিকে দেখা যায়। এই হিমবাহটির নাম কী ?
(৯) আইসল্যান্ডে 'স্নেফেল' নামে একটি আগ্নেয়গিরি আছে। এই আগ্নেয়গিরিকে কল্পনা করে জুলে ভার্ন একটি বিখ্যাত উপন্যাস লিখেছিলেন। উপন্যাসটির নাম কী ?
(১০) ১৯৮০ সালে পৃথিবীতে প্রথম এক মহিলা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। কোন দেশ ? মহিলার নাম কী ?
(১১) পৃথিবীর সব প্রাণী ও উদ্ভিদের এক-একটি নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক নাম আছে। সুইডেনের একজন প্রকৃতিবিজ্ঞানী প্রথম এই বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়ার প্রথা চালু করেন। তাঁর নাম কী ?
(১২) নরওয়েতে জন্মেছিলেন বিখ্যাত নাট্যকার হেনরিক ইবসেন। তাঁর লেখা প্রথম নাটকের নাম কী ?
(১৩) নির্বাক যুগের বিখ্যাত অভিনেত্রী গ্রেটা গার্বো জন্মসূত্রে সুইডেনের নাগরিক। তাঁর আসল নাম কী ?
(১৪) গ্রেটা গার্বো প্রথম কোন ছবিতে অভিনয় করেছিলেন ?

আলফ্রেড নোবেল

(১৫) বিখ্যাত আবিষ্কারক আলফ্রেড নোবেল-এর শেষ ইচ্ছানুসারে মানুষের মঙ্গলের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। আলফ্রেড নোবেল এই পুরস্কারের জন্য কত মূলধন রেখে গিয়েছিলেন ?
(১৬) সুইডেনের কোন প্রধানমন্ত্রী আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন ?
(১৭) সুইডেনের জোনোকোপিং শহরে একটি অদ্ভুত জাদুঘর আছে। এই জাদুঘরটির বৈশিষ্ট্য কী ?
(১৮) স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশগুলির জনপ্রিয়তম উৎসব কোনটি ?
(১৯) 'ডি নোভা স্টেলা' কী ?
(২০) ডেনমার্কের একজন রাজা যুদ্ধে ইংরেজদের পরাস্ত করে ইংল্যান্ডের রাজা হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁকে নিয়ে অসংখ্য লোকগাথা, গান ও গল্পের জন্ম হয়। তাঁর নাম কী ?
(২১) তিনটি স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশে এখনও সাংবিধানিক রাজতন্ত্র টিকে আছে। কোন কোন দেশ ?

ইবসেন

উত্তর : (১) ১৯৬২ সালে হেলসিঙ্কি চুক্তির পর ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড, নরওয়ে ও সুইডেন এই পাঁচটি দেশ একত্রে সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক উন্নয়নের এক কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই পাঁচটি দেশকেই একত্রে স্ক্যান্ডিনেভিয়া বলা হয়। পাঁচটি দেশের ডাকমাসুলের হার একরকম, একই পাসপোর্টে পাঁচটি দেশে ঘোরা যায়। (২) কন্টিকি। (৩) স্টকহল্‌ম, মালার হ্রদের তীরবর্তী এই শহরটি সুইডেনের বর্তমান রাজধানী। (৪) গোটেনবার্গ। এই শহরটি সুইডেনে অবস্থিত। (৫) কালেভালা। (৬) ১৯৬৩ সালে আইসল্যান্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম সমুদ্রোপকূলে আগ্নেয়গিরির লাভাঘটিত বিস্ফোরণের ফলে প্রায় ২·৮ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এক নতুন দ্বীপের সৃষ্টি হয়। এই দ্বীপেরই নাম দেওয়া হয়েছে সার্তসি। (৭) ধোঁয়ার উপসাগর। (৮) ভাৎনাজকুল। এই হিমবাহের আয়তন প্রায় ৮,৪০০ বর্গকিলোমিটার। (৯) জার্নি টু দ্য সেন্টার অব দ্য আর্থ। (১০) আইসল্যান্ড। ভিগ্‌দিস ফিন্‌বোগাডোটির। ইনিই বিশ্বের প্রথম মহিলা-রাষ্ট্রপতি। (১১) কার্ল লিনিয়াস। তাঁর নামেই এই বৈজ্ঞানিক নাম রাখার প্রথাকে 'লিনিয়ান হায়ারকি' বলা হয়। (১২) কাতিলিন। (১৩) গ্রেটা লোভিস্তা গাস্টাফস্‌ন। (১৪) দ্য ট্রাম্প। (১৫) তেত্রিশ মিলিয়ন ক্রোনার। (১৬) ওলফ পালমে। (১৭) জোনোকোপিং শহরে প্রথম দেশলাই-শিল্প শুরু হয়। এই জাদুঘরে বিভিন্ন দেশলাই-বাক্সের লেবেল রয়েছে। (১৮) মিড্‌সামারস ইভ। ২৪ জুনের কাছাকাছি কোনও শনিবার এই উৎসবটি পালিত হয়। (১৯) ডেনমার্কের বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী টাইকো ব্রাহে এই গ্রন্থে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর যাবতীয় ধারণা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। (২০) রাজা ক্যানিউট। (২১) ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেন।

ঈগলদের দেশে

ইংল্যান্ডের গ্রামের এক রাজমিস্ত্রির ছেলে অ্যান্টর। বয়স বছর ছয়েক। খুব জেদি এবং দুষ্টু। তার বাবা বাড়ি থেকে বেরোবার সময় পইপই করে বলে গিয়েছিলেন বাড়ির পাশের উঁচু গির্জাটা সারানোর জন্য তিনি যে লম্বা মইটা লাগিয়ে গেলেন, সেটায় না চড়তে। অ্যান্টরের খুব ইচ্ছেও যে ছিল এমন নয়, কিন্তু তার জুতোটা যেন তার দুটো পা-কে টেনে নিয়ে গেল মইয়ের দিকে। উঠছে তো উঠছেই, শেষে যখন একদম চূড়ায় উঠে পড়েছে, তখন অ্যান্টর বুঝতে পারল, হঠাৎ কে যেন পিছন থেকে তাকে জাপটে ধরেছে, আর শূন্যে হাওয়ার মধ্যে টেনে নিয়ে গেছে। ভ্যাবাচাকা অ্যান্টর খানিক পরে জানতে পারল তাকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে একটি বিরাট ঈগল পাখি। তারপর অনেক-অনেক দূরে ঈগলদের দেশে পৌঁছল অ্যান্টর। সেখানে তাকে ঈগলদের সঙ্গেই বসবাস করতে হল। ঈগল পাখিরা তাকে আদর-যত্ন করত, ছোটখাটো কাজের দায়িত্বও দিত। তাকে খেতে হত কাঁচা মাংস। তারপর অ্যান্টরকে ঈগলরা শেখাল ওড়ার কায়দা। একসময় উড়তেও শিখে গেল অ্যান্টর! উঁচু আকাশের গা ঘেঁষে ওড়ার যে কী আনন্দ! একসময়, ঈগলদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে ফিরে এল বাড়িতে। অ্যান্টর স্কুলে যেতে চাইত না কিছুতে। কিন্তু ঈগলদের দেশে সে যেসব জীবনবোধ, ভালবাসা, মনের প্রসারতা শিখেছিল, সেগুলো শিখতে তার একটুও কষ্ট হয়নি, বরং ভীষণ আনন্দ হয়েছিল।
শিশুদের কল্পনার জগৎকে চমৎকার ভঙ্গিতে সমৃদ্ধ করেছেন উইলিয়ম মেইন তাঁর এই সাম্প্রতিক উপন্যাস 'অ্যান্টর অ্যান্ড দ্য ঈগলস'-এর মধ্যে। বইটির প্রকাশক ডেলকার্ট সংস্থা। দাম : ১৩·৯৫ ডলার।

ভূতের গল্প

আমেরিকার বিখ্যাত ভূতের গল্পের লেখক ফ্রিৎস লেবারের চুয়াল্লিশটি সেরা কাহিনী সঙ্কলনের আকারে প্রকাশ করেছেন ডার্ক হারভেস্ট প্রকাশন সংস্থা। বইটির সম্পাদক মার্টিন এইচ গ্রিনবার্গ। দাম ২১·৯৫ ডলার। লেবার বহুদিন ধরে ছোটদের জন্য লিখছেন। হাড়-কাঁপানো ভয়ের গল্প পড়তে যারা ভালবাসে তাদের কাছে এ-বইটি নিশ্চয়ই সমাদৃত হবে। ১৯৪০ সালে লেখা 'দ্য অটোমেটিক পিস্তল' গল্পটি বেশ ভাল। এক ডাকসাইটে খুনি-র জীবনে তার পিস্তল ছিল ভীষণ প্রিয় বস্তু। মারামারি করতে গিয়ে মরে গেল সেই গুণ্ডাসর্দার। কিন্তু তারপর পিস্তলটা নিজেই বের হল প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে···।

এ ছাড়াও স্মোক গোস্ট, হরিবল ইমাজিনিংস, দ্য ম্যান হু মেড ফ্রেন্ডস উইথ ইলেকট্রিসিটি মনে দাগ কাটার মতো গল্প। বইটি পড়ার পর রাত্তির হলেই নিজেকে খুব একা মনে হয়।

ছড়া এবং নাটক

ছড়ার রাজা
অশোক রায়চৌধুরী
কল্পনা বুক হাউস
কলকাতা—৯, দাম : বারো টাকা

শরৎ একাঙ্কিকা
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
নাট্যরূপ : বিকর্ণ সেন
সাহা বুক স্টল
শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা—৭৩, দাম : পনেরো টাকা

'ছড়ার রাজা' বইটি ৪১টি সুন্দর ছড়ার সঙ্কলন। ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ, কৌতুক ও আনন্দের সঙ্গে ছোটদের জন্য প্রয়োজনীয় নানা তথ্য ছড়াগুলিকে মজাদার করে তুলেছে। বড়-বড় হরফে ছাপা বইটির পাতায়-পাতায় রঙিন ছবি।
কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত রচনা 'মহেশ', 'অভাগীর স্বর্গ' এবং 'রামের সুমতি'-র সুন্দর নাট্যরূপ দিয়েছেন বিকর্ণ সেন। নাটক তিনটি পড়তেও যেমন ভাল, তেমনই অভিনয় করার পক্ষেও উপযুক্ত। নাটক বিষয়ে যাঁরা উৎসাহী বইটি তাঁদের খুব কাজে লাগবে।

কাজল চক্রবর্তী

কিশোর কবির ছড়া

হাতে খড়ি
নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
পূর্বপল্লী, শান্তিনিকেতন
দাম : দশ টাকা

একশো পঁচিশটি ছড়া নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একশো পঁচিশতম জন্মবর্ষে শ্রদ্ধা জানিয়েছে নীলাঞ্জন। স্কুলে পড়ে নীলাঞ্জন। সাত বছরে লেখা ছড়াগুলি কালানুক্রমিকভাবে ছাপা হয়েছে বইটিতে। বাবা, মা, ভাইবোন, সহপাঠীদের নিয়ে যেমন ছড়া লিখেছে নীলাঞ্জন তেমনই গরিব সাঁওতাল মেয়ের কষ্ট তাকে বেদনার্ত করেছে, দেশাত্মবোধক চিন্তা ছুঁয়ে গেছে তার কবিকল্পনাকে। বইটিতে ছবিগুলিও কিন্তু এঁকেছে নীলাঞ্জন নিজেই।

উত্থানপদ বিজলী

কল্পবিজ্ঞান কাহিনী

আর্থার সি ক্লার্ক ও জেনট্রি লি লিখিত 'রামা-টু' বহুদিন মনে রাখবার মতো সায়েন্স ফিকশন বা কল্পবিজ্ঞানের গল্প। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে রুদ্ধশ্বাস একটি কল্পকাহিনী লিখেছিলেন ক্লার্ক, যার নাম ছিল, 'রাঁদেভু উইথ রামা'। সেই গল্পের খেই ধরে রামা-টু উপন্যাসটি লিখিত। বলা যায়, এটি ওই উপন্যাসটির দ্বিতীয় পর্ব। নতুন আবিষ্কৃত একটি গ্রহে পাঠানো হল একজন সাংবাদিক, একজন বৈজ্ঞানিক, একজন শিল্পী ও দু'জন তীক্ষ্ণবুদ্ধি উজ্জ্বল ছাত্রকে। তারপর সেই গ্রহে ঘটনার ঘনঘটা। শেষে কি তাঁরা সকলেই সুস্থ শরীরে ফিরে এলেন পৃথিবীতে? সেই গল্প জানতে গেলে বইটা পড়ে ফেলতে হবে। প্রকাশক ব্যান্টস স্পেকট্রা সংস্থা, দাম : ১৮·৯৫ ডলার।

তুরস্কের গল্প

গেইয়ে হাইসিলমাজের লেখা 'এগেনস্ট দ্য স্টরম' উপন্যাসটির একটা অভিনবত্ব এই যে, এর পটভূমি তৃতীয় বিশ্বের এক দেশ। গল্পটাও সুন্দর। লেখক নিজে বহুদিন তুরস্কে ছিলেন, তাই তাঁর হাতে সে দেশ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। গল্পের নায়ক মেহমেত, তুরস্কের আঙ্কারার এক গরিব কৃষক। জমিদারের অত্যাচারে সে গ্রাম ছেড়ে দূরের এক দুর্গম অঞ্চলে চলে যায়। সেখানে আলাপ হল এক তরুণ জিপসি ছেলের সঙ্গে। মেহমেতের সম্বল একটা কুকুরছানা আর জিপসি ছেলেটির থাকার মধ্যে আছে একটা ঘোড়া। দুই বন্ধু কিছুদিন সুখে কাটাল। তারপর পর পর দুর্ঘটনায় মারা গেল জিপসি ছেলেটি আর মেহমেতের কুকুর। শোকে-দুঃখে ভেঙে পড়ল মেহমেত। ফিরে এল আবার গ্রামে। সেখানে পৌঁছে অত্যাচারী জমিদারের পাল্লায় পড়ল সে। শেষ পর্যন্ত সেই জমিদারের বিরুদ্ধে গ্রামের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সে করল লড়াই আর অত্যাচারী জমিদারকে তাড়িয়ে গ্রামে ফিরিয়ে আনল সুখ-শান্তি। বইটির প্রকাশক ভাইকিং সংস্থা। দাম ৭·৯৯ পাউণ্ড।

অভীক মজুমদার

ধাঁধা

গেলাম ডাকটিকিট দেখাতে, ফিরে এলাম ইংরেজি উচ্চারণের একটা জব্বর ধাঁধা নিয়ে। এর নাম ছোট্কা। ধরলে আর ছাড়া নেই। এমন জানলে আমি কি সাততাড়াতাড়ি ছুটে যেতাম, ছোট্কাকে নতুন-পাওয়া ডাকটিকিটগুলো দেখাতে ?

কারও মনে হয়তো প্রশ্ন উঠতে পারে, ডাকটিকিটগুলো নিয়ে আমি ছোট্কার কাছে ছুটে গেলাম কেন ? আসলে ছোট্কা যে ডাকটিকিটের একজন ভালরকমের সমঝদার এ-বিষয়ে তো কোনও সন্দেহ নেই। ডাকটিকিটের হালফিলের নানা খবর তিনি রাখেন। কোন দেশ নতুন কী ডাকটিকিট বের করল, দেশবিদেশের ডাকটিকিট সংগ্রাহকদের ভাণ্ডারে নতুন কী কী সম্পদ জমা পড়ল এ-ধরনের নানা খবর তাঁর নখদর্পণে। আর, ধাঁধার ব্যাপারটাই বা কী বলব। ছোট্কার বুদ্ধির তুলনা নেই। চটজলদি কত কিছুই না তাঁর মাথায় আসে। নানা বিষয়ে তাঁর আগ্রহ। এমন সব বিষয়ের খোঁজখবর রাখেন যে দেখে অবাক হতে হয়। ডাকটিকিট দেখাতে গিয়ে এটাই আরও বেশি করে বুঝতে পারলাম। তবে উনি ধাঁধার জালে জড়িয়ে দেবেন এটা জানলে ওঁর কাছে দৌড়ে যেতাম কি না সন্দেহ। কিন্তু গিয়ে যখন পড়েছি, ধাঁধা না নিয়ে নিস্তার নেই। তাই ধাঁধাটা আপাতত তোমাদের চালান করে দিই। আমি একা কেন ভাবব, তোমরাও ভাবো। তার আগে বলি, কী থেকে কী হল। কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে গেলাম। আমি অনেক নতুন ডাকটিকিট জোগাড় করেছি। ভাবলাম, যাই,

ছোট্কাকে দেখিয়ে আসি। তো, ছোট্কা বেশ দেখছিল স্ট্যাম্পগুলো। নানারকম মজার মন্তব্য করছিল মাঝেমধ্যে। কিন্তু হঠাৎই ছোট্কা খুব নিরীহ গলায় প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, স্ট্যাম্প জমানোকে ইংরেজিতে যেন কী বলে ? মনে আছে সতুবাবু ?" "ফিলাটেলি।" আমি চটপট জবাব দিই, "কেন মনে থাকবে না ?" "বেশ। খুব ভাল।" ছোট্কা আবার নিরীহ গলায় বলল, "ফিলাটেলি হল ডাকটিকিট জমানো, ফিললজি হল ভাষাতত্ত্ব, ফিলজফি হল দর্শন, ছবির ইংরেজি ফোটোগ্রাফ —এমন কত শব্দই না আমরা জানি। একটা জিনিস খেয়াল করো সতুবাবু, এই প্রত্যেকটা ইংরেজি শব্দে আছে পি আর এইচ। যেমন, ফোটোগ্রাফ Photograph ! আর এই পি ও এইচ এর উচ্চারণ সব ক্ষেত্রেই 'ফ' বা 'এফ'-এর মতো। তাই না ?"

একটু ভেবে নিয়ে আমি বললাম, "হ্যাঁ, প্রত্যেক ক্ষেত্রে পি আর এইচ মিলে বাংলা 'ফ' বা ইংরেজি 'এফ'-এর উচ্চারণ হচ্ছে।"

"এবার তা হলে সতুবাবু এমন তিনটে ইংরেজি শব্দ বলো, যেখানে পি আর এইচ পাশাপাশি তবু 'ফ' বা 'এফ'-এর উচ্চারণ আসছে না। চটপট বলে ফ্যালো। নাকি ভেবে বলবে ?" ছোট্কা এতক্ষণে আসল প্রশ্নটা করল।

আমি তো সেই থেকে ভাবছি। তোমরাও ভাবো তো। এটাই হোক **প্রথম ধাঁধা**। বেশ অন্যরকম ধাঁধা। তাই না ?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ মানুষের মুখেও আছে আবার কামারের মধ্যেও আছে, কী তা বলতে পারো ?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—
বাকুজমসু

গতবারের উত্তর ॥ (১) ঠাকুরদার বয়স ৭৩, নাতি দুটির ৭ ও ৩। (২) একতারা কি দোতারা। (৩) অহিতুণ্ডিক। মানে সাপুড়ে।

সত্যসন্ধ

মজার খেলা

বারোটা পোড়া দেশলাইকাঠি কিংবা একই মাপের এক ডজন টুথপিক দিয়ে এবারের সহজ মজার খেলা। তুমি করবে কী, কাঠি বারোটা দিয়ে নীচে দেখানো ছবির মতো একটা ছবি টেবিলের ওপর বন্ধুদের চোখের সামনে সাজিয়ে দেবে। ঠিক এইরকম—

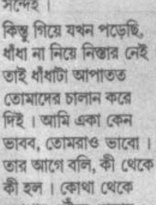

এবার বন্ধুদের বলো, কী করতে হবে। এখানে রয়েছে পাঁচটা বর্গক্ষেত্র। চারটে সমান মাপের এবং সেই ছোট চারটেকে একসঙ্গে ধরে একটা বড় মাপের বর্গক্ষেত্র। এখন, এর থেকে গুনে-গুনে দুটো কাঠি সরিয়ে ফেলতে হবে। এমনভাবে, যাতে কিনা টেবিলে পড়ে থাকে দুটো মাত্র বর্গক্ষেত্র। একটা জিনিস বুঝতে পেরেছি যে, দুটো কাঠি সরিয়ে দুটো সমান মাপের বর্গক্ষেত্র কখনওই টেবিলের ওপর দেখানো যাবে না। কিন্তু প্রশ্নের কি সেরকম কোনও শর্ত ছিল ? তা কিন্তু ছিল না। আর তাই, ছবিটার ভেতরের দুটো কাঠি সরিয়ে দুটোমাত্র বর্গক্ষেত্র টেবিলে ফেলে রাখার একটা সমাধান এইরকম—

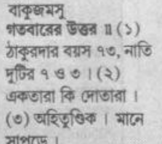

মজারু

কত কথা

কথার মারপ্যাঁচের অদ্ভুত সূত্র ধরে এক-একটা শব্দ তৈরির মজাই আলাদা। গত সংখ্যায় তোমরা তেমনই কয়েকটি শব্দ পেয়েছিলে। এবারে আরও তিনটি দেওয়া হল।

(ক) কম্বল উলটে গিয়ে গাছ হয়েছে।
(খ) ঝুল জমেছে বারান্দায়।
(গ) ঘণ্টা বাজাও কানে পাবে এক ফুল।

২। এবার চার অক্ষরের এমন তিনটি শব্দ তৈরি করো যেগুলো আগাগোড়া হ্রস্ব-ইকারযুক্ত। অবশ্যই নীচের সূত্র অনুসারে।
(ক) সামান্য কারণে যে-ঝগড়া।
(খ) জলের ওপর যে-খেলা, সে-খেলা জীবন নিয়ে করা উচিত নয়।
(গ) তুষের আগুন যেমনভাবে জ্বলে।

৩। (ক) কোন্ চৌকিতে বাজনা বাজে ? (খ) কোন্ মাসের দিন নেই, হাড় আছে ?

উত্তর : ১। (ক) উলটকম্বল। (খ) ঝুলবারান্দা। (গ) ঘণ্টাকর্ণ। ২। (ক) খিটিমিটি। (খ) ছিনিমিনি। (গ) ধিকিধিকি। ৩। (ক) রোশনচৌকি। (খ) হাড়মাস।

কথক

ভরপূর শক্তি চকোলেটে ভর্তি

আজ্ঞে হ্যাঁ, নতুন ভিভা চকোলেট স্বাদে আর স্বাস্থ্যে ভরপূর। কেননা, ভিভা- ৮টি অত্যাবশ্যক ভিটামিনে ভরপূর একমাত্র ড্রিঙ্ক যাতে এখন চকোলেটেরও মজা। এবার দেখুন, এই ৮টি জরুরী ভিটামিন কিভাবে আপনার সুস্বাস্থ্য গড়ে তোলে। ভিটামিন–এ দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়, ভিটামিন–বি$_1$ ক্ষিদে বাড়ায়, ভিটামিন–বি$_2$ বিপাকীয় ক্রিয়া ঠিক রাখে, ভিটামিন–বি$_{12}$ রক্ত তৈরী করে, ভিটামিন–সি দাঁত ও হাড় মজবুত করে, ভিটামিন–ডি দেহ গঠন করে, ফলিক অ্যাসিড কোষকলা মজবুত করে, নিয়াসিন স্বাভাবিক বিকাশে সাহায্য করে। এছাড়া, ভিভা চকোলেটে আছে সহজপাচ্য দুধ, প্রোটীন, কার্বোহাইড্রেট আর মিনারেল। তাইতো, ভিভা এক পূর্ণ স্বাস্থ্য ড্রিঙ্ক। আপনার পরিবারকে আজ থেকেই দিন ভিভা চকোলেট। ভিভার প্রাণশক্তি আপনাকে দেবে সুস্বাস্থ্য।

দুধ দেওয়াই আছে, স্রেফ্ জল মেশালেই হ'লো।

অধিক শক্তি ও উদ্যমের জন্য ৮টি জরুরী ভিটামিন

everest/d90/JIL/184 ben

ANANDAMELA 13 JUNE 1990 REGD.NO.
WB/CC/264 MH BY SOUTH 683 TN MS(C) 731